ইবনুল কাইয়্যেম রহ.-এর আল-ফাওয়ায়েদ অবলম্বনে

মুখতাসারুল ফাওয়ায়েদ

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

ড. আহমাদ ইবন উসমান আল-মাযইয়াদ

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল মামুন আল-আযহারী

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مختصر الفوائد ابن قيم الجوزية

د/ أحمد بن عثمان المزيد

ترجمة: عبد الله المأمون الأزهري

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গুরুত্বপূর্ণ কায়েদা: কীভাবে কুরআনের দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়?

তুমি কুরআনের দ্বারা উপকৃত হতে হলে কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণের সময় মনোনিবেশ করো, নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করো এবং যিনি কুরআনে তোমাকে সম্বোধন করে তোমার সাথে কথা বলছেন সে মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি অনুভব করো। কেননা কুরআন তোমার জন্য রাসূলের জবানে আল্লাহর সম্বোধন ও বার্তা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكۡرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلۡبٌ أَوۡ أَلۡقَى ٱلسَّمۡعَ وَهُوَ شَهِيدٞ ٣٧﴾ [ق: ٣٧]

“নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার রয়েছে অন্তর অথবা যে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে।” [সূরা কাফ, আয়াত: ৩৭] কুরআনের পূর্ণ প্রভাব (উপকার বা উপদেশ) লাভ করা যেহেতু প্রভাবকারী, প্রভাব বিস্তারের স্থান, প্রভাব লাভের শর্ত ও উপকার লাভ থেকে বাধামুক্ত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু উপরোক্ত আয়াতে সংক্ষিপ্তসারে কিন্তু পূর্ণাঙ্গরূপে এসব কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী, ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكۡرَىٰ﴾ [ق: ٣٧] “নিশ্চয় এতে (কুরআনে) উপদেশ রয়েছে তার জন্য।” [সূরা কাফ, আয়াত: ৩৭] সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত অংশে কুরআনের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বাণী, ﴿لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلۡبٌ﴾ [ق: ٣٧] "যার রয়েছে অন্তর।" [সূরা কাফ, আয়াত: ৩৭] এটি প্রভাব (উপকার) গ্রহণের স্থান। এখানে ক্বলব দ্বারা জীবন্ত অন্তরকে বুঝানো হয়েছে, যে অন্তর আল্লাহকে চেনে ও জানে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّبِينٞ ٦٩ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّٗا ٧٠﴾ [يس: ٦٩، ٧٠]

"এ তো কেবল এক উপদেশ ও স্পষ্ট কুরআন মাত্র। যাতে তা সতর্ক করতে পারে ঐ ব্যক্তিকে যে জীবিত।" [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬৯-৭০] অর্থাৎ যার অন্তর জীবিত।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿أَوۡ أَلۡقَى ٱلسَّمۡعَ ٣٧﴾ [ق: ٣٧] "অথবা যে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে।" [সূরা কাফ, আয়াত: ৩৭] অর্থাৎ সে শ্রবণে মনোনিবেশ করে এবং যা কিছু বলা হয় তা কান লাগিয়ে শোনে। কথা দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার এটি অন্যতম শর্ত।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿وَهُوَ شَهِيدٞ ٣٧﴾ [ق: ٣٧] "সে অন্তরসহ উপস্থিত।" [সূরা কাফ, আয়াত: ৩৭] অর্থাৎ তার অন্তর সেখানে উপস্থিত, সে মনের দিকে অনুপস্থিত নয়।

ইবন কুতাইবা রহ. বলেছেন, "আল্লাহর কিতাব নিবিষ্টচিত্তে ও বুঝে-শুনে শ্রবণ করো, গাফিল ও অন্যমনস্ক হয়ে নয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেউ গাফিল ও অমনোযোগী হয়ে তিলাওয়াত করলে তা কুরআনের উপকার অর্জনে বাধাদানকারী হয়ে যায়। কুরআনে তাকে যা বলা হয়েছে

তা না বুঝে, এতে চিন্তা-গবেষণা না করে ভুলোমন ও অমনোযোগী হয়ে পড়লে কুরআন উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

অতএব, প্রভাববিস্তারকারী (কুরআন) যখন প্রভাববিস্তারের স্থান (অর্থাৎ জীবন্ত অন্তর), প্রভাব বিস্তারের শর্ত (অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ), প্রভাববিস্তারে বাধামুক্ত (তথা অন্তরকে কুরআনের সম্বোধন অনুধাবনে ব্যস্ত রাখা ও অন্য কাজ থেকে বিরত থাকা) সবকিছু একত্রে অর্জিত হলে কুরআনের প্রভাব তথা উপকার ও উপদেশ অর্জিত হবে।

এ সূরাতে ঈমানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলনীতি সন্নিবেশিত হয়েছে যা ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট এবং অন্য কিছু থেকে তাকে অমুখাপেক্ষী করে। কেননা এতে সৃষ্টির শুরু, পুনরুত্থান, তাওহীদ, নবুওয়াত, ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান, মানুষকে সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবান দুদলে বিভক্ত করা এবং এ দু'দলের বিবরণ আলোচনা করা হয়েছে।

- এতে দু'টি কিয়ামত তথা কিয়ামতে সুগরা (ছোট কিয়ামত তথা মৃত্যু) ও কিয়ামতে কুবরা (বড় কিয়ামত বা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- দুটি আলাম (জগতের) তথা বড় জগত বা আখিরাত ও ছোট জগত বা দুনিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- মানব সৃষ্টি, তাদের মৃত্যু, পুনরুত্থান, মৃত্যুর সময় তাদের অবস্থা, হাশরের দিনের অবস্থা, সবকিছু সবদিক থেকে আল্লাহর বেষ্টনীতে; এমনকি তাদের অন্তরের ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) পর্যন্ত তাঁর জ্ঞাত থাকা, মানুষের ওপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করা, তারা যা কিছু

বলে সব কিছুই সংরক্ষণ করে রাখা; আর কিয়ামতের দিন তিনি তাকে যথাযথ পুরস্কার প্রদান, সেদিন সে উপস্থিত হবে, তার সাথে থাকবে একজন চালক, যিনি তাকে আল্লাহর দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন, আরও থাকবে একজন সাক্ষী, যিনি তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন। যখন তার চালক তাকে উপস্থিত করবে তখন সে বলবে,

﴿هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۝٢٣﴾ [ق: ٢٣]

“এই তো আমার কাছে (আমল নামা) প্রস্তুত।” [সূরা কাফ, আয়াত: ২৩] অর্থাৎ এ আমলনামা প্রস্তুত করতে আমি আদিষ্ট ছিলাম, আজ আমি তা প্রস্তুত করেছি। আমলনামা উপস্থিত করলে তাকে বলা হবে,

﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۝٢٤﴾ [ق: ٢٤]

“তোমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ করো প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে।” [সূরা কাফ, আয়াত: ২৪] যেভাবে অপরাধীকে বাদশার সামনে উপস্থিত করে বলা হয়, অমুককে আমি তার কৃতকর্মসহ উপস্থিত করেছি, তখন বাদশা বলেন, তাকে জেলখানায় নিয়ে যাও এবং তার অপরাধ অনুযায়ী তাকে শাস্তি দাও।

***

গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা: আল্লাহ জমিনকে মানুষের উপকারার্থে নিয়োজিত করে দিয়েছেন

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ ١٥﴾ [الملك: ١٥]

“তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ করো এবং তাঁর রিযিক থেকে তোমরা আহার করো। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১৫]

আল্লাহ এ আয়াতে বলেছেন, তিনি জমিনকে মানুষের জন্য সুগম করে দিয়েছেন, তাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন যাতে তারা তাতে হাঁটতে পারে, খনন করতে পারে, ফাটাতে পারেন ও এর উপর ঘর-বাড়ি বানাতে পারেন। তিনি জমিনকে এমন কঠিন ও অনুপযোগী করেন নি, যাতে কেউ এতে আবাদের কাজ করতে চাইলে তা বাধাগ্রস্ত হয়।

এ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা‘আলা জমিনকে অনুগত উটের ন্যায় অনুগত ও সুগম করে দিয়েছেন, যাতে জমিনকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কাজে লাগানো করা যায়। মানাকিবিহা (مناكبها) বা জমিনের ঘাড় বলে, পথ-প্রান্তর ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকাকে বুঝানো অতীব সুন্দর বলে বিবেচিত হয়েছে; কারণ এর আগে সেটাকে সুগম বলা হয়েছে। সুতরাং এসব পথ-প্রান্তর ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকার ওপর পায়ে

হেঁটে চলাচলকারী যেন এর ঘাঁড়ের উপর দিয়েই চলছে। কারণ মানুষের মানাকিব তথা ঘাঁড় হলো তার সর্বোচ্চ স্থান। আর তাই মানাকিব শব্দের ব্যাখ্যা কেউ কেউ পাহাড় করেছেন; যা মানুষের ঘাঁড়ের ন্যায়; যার অবস্থান তার সর্বোপরে।

কেউ কেউ বলেছেন, এতে এ কথার প্রতিও সতর্ক ইঙ্গিত রয়েছে যে, জমিনের সহজতর স্তরে (সমতলে) চলা মানাকিবে (পথ-প্রান্তর ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকায়) চলার চেয়ে অধিকতর সহজ।

আরেকদল বলেছেন, মানাকিব (مناكب) হলো, পার্শ্ব ও কিনারা। যেমন (مناكبُ الإنسانِ لجوانبِهِ) মানুষের পার্শ্বদেশকে মানাকিব বলা হয়।

আমার মতে, মানাকিব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপরিভাগ। এ হিসেবে জীব-জন্তু জমিনের উপরিভাগে চলাচল করে, এর নিম্নভাগে চলাচল করে না। কেননা ভূ-পৃষ্ঠের ছাদ হলো উপরিভাগ। আর চলাচল করে উপরিভাগে। মানাকিবকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ বলে ব্যাখ্যা করা উত্তম, যেহেতু এর গুণ বর্ণনায় বলা হয়েছে এটি সুগম।

অতএব, এ আয়াতে কারীমা আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, একত্ববাদ, কুদরত, হিকমত ও তাঁর সূক্ষ্ম সৃষ্টির প্রমাণ, তার নি'আমত ও ইহসানের স্মরণ, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে যাওয়া ও একে স্থায়ী আবাস বানানো হতে সতর্কতা; বরং জান্নাতের দিকে এগিয়ে যেতে দুনিয়াতে অতিদ্রুত চলা ইত্যাদি শামিল করেছে। আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা, তিনি এ আয়াতে তাঁর পরিচয়, তাঁর তাওহীদ, তাঁর নি'আমতের স্মরণ, তাঁরই দিকে

প্রত্যাবর্তন, তাঁর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি, তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া, তাঁর ঘোষণা তিনি এ দুনিয়াকে এমনভাবে গুটিয়ে নিবেন যেন তা আগে ছিলো না, এ দুনিয়ার অধিবাসীদেরকে মৃত্যুর পরে পুনঃজীবিত করবেন এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

***

ফায়েদা: মানুষের সৌভাগ্যের কারণসমূহ

মানুষের দু’ধরণের শক্তি রয়েছে। চিন্তা ও তত্ত্বগত জ্ঞান সম্বলিত শক্তি (قوّةٌ علميَّةٌ نظريَّةٌ) এবং ইচ্ছা ও কর্মগত শক্তি (قوّةٌ عَمليَّةٌ إراديَّةٌ)। মানুষের জ্ঞানগত ও ইচ্ছাগত শক্তির পূর্ণতার ওপরই তার পরিপূর্ণ সৌভাগ্য নির্ভর করে।

* আর মানুষ কর্তৃক তার সৃষ্টিকর্তাকে জানা, তাঁর নাম ও গুণাগুণসমূহ সর্ম্পকে অবগত হওয়া, যে পথে তাঁকে পাওয়া যায় সে পথ জানা, তার নিজের পরিচয় জানা ও নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ইলমী শক্তি পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং সর্বাধিক বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোক সে ব্যক্তি যে এগুলোর পরিচয় লাভ করে এবং এ গুলো সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখে।

* আর মানুষ কর্তৃক তার ইচ্ছা ও কর্মগত শক্তি তখনই অর্জিন করবে, যখন সে তার রবের হকসমূহ যথার্থভাবে রক্ষা করবে, এ হকসমূহ ইখলাস, সততা, একনিষ্ঠতা, ইহসান ও অনুসরণের সাথে পালন করবে, তার ওপর তার রবেব অনুগ্রহসমূহের সাক্ষ্য দিবে, তাঁর হকসমূহ

আদায়ে নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করবে, তার দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার জন্য সে অত্যন্ত লজ্জিত হবে। কেননা সে জানে যে, তার যতটুকু ইবাদত-বন্দেগী করা উচিৎ সে ততটুকু পালনে অক্ষম, নিতান্ত কম হকই সে আদায় করছে, অনেক অনেক কমই সে আদায় করছে।

বস্তুত তাঁর সাহায্য ব্যতীত এ দু'শক্তি পরিপূর্ণ করা অসম্ভব, সে সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সরল সঠিক পথের হিদায়াত প্রাপ্ত হতে একান্তভাবে নিরুপায় হয়ে তার সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল, যে পথ তিনি তাঁর অলী ও বিশেষ প্রিয়জনকে পরিচালিত করেছেন। অনুরূপভাবে সে সরল সঠিক পথ থেকে বেরিয়ে আসতে হয় এমন কাজ থেকে তাকে যেন বাঁচতে পারে (এতেও তার সাহায্যের উপর নির্ভরশীল)। হয় তার ইলমী বা জ্ঞানগত শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে, ফলে সে পথভ্রষ্ট হবে অথবা তার আমলী বা কর্মগত শক্তি বিনষ্ট হবে, ফলে তার ওপর আল্লাহর রাগ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যাবে।

বস্তুত উপরোক্ত জিনিসগুলো অর্জিত না হলে মানুষের পূর্ণতা ও তার সৌভাগ্য কখনও পরিপূর্ণ হবে না। সূরা ফাতিহায় এ সব কিছু খুব সুন্দরভাবে ও পরিপূর্ণ সুশৃঙ্খল-রূপে একত্রিত হয়েছে।

সূরা ফাতিহার শুরুতে আল্লাহর রহমত, মধ্যভাগে তাঁর হিদায়াত ও শেষভাগে তাঁর নি'আমতের কথা আলোচিত হয়েছে। আল্লাহর হিদায়াত লাভের অংশ অনুযায়ী বান্দা তাঁর নি'আমত লাভ করবে, আবার তাঁর রহমত লাভের অংশ অনুযায়ী সে তাঁর হিদায়াত লাভ করবে। সুতরাং সব কিছুই তাঁর নি'আমত ও রহমতের মধ্যেই ঘূর্ণায়মান। আর রহমত

ও নি'আমত আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের আবশ্যকীয় গুণ। অতএব, যিনি রব হবেন তিনি রহমতদানকারী ও নি'আমতদানকারী না হয়ে পারেন না। আর এ গুণগুলো আল্লাহর উলুহিয়্যাত বা তাঁর ইলাহ হওয়াকে বাধ্য করে। সুতরাং তিনিই সত্য ইলাহ, যদিও অস্বীকারকারীরা অস্বীকার করে এবং মুশরিকরা তাঁর সাথে শির্ক করে।

অতএব, যার মধ্যে সূরা ফাতিহার সম্পূর্ণ অর্থ জ্ঞানগত, পরিচিতিগত, কর্মগত ও অবস্থাগতভাবে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে সে-ই পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করবে, তার উবুদিয়্যাত বা দাসত্ব হবে আল্লাহর নি'আমতপ্রাপ্ত বিশেষ লোকদের দাসত্বের মতো, যাদের মর্যাদা সাধারণ ইবাদতকারীদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। আল্লাহই সাহায্যকারী।

***

ফায়েদা: কীভাবে তোমার রবকে চিনবে?

আল-কুরআনে মহান রব দু'টি উপায়ে তাঁকে চেনার জন্য বান্দাদেরকে আহ্বান করেছেন। সে পদ্ধতি দু'টি হলো:

প্রথমত: তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ও গভীরভাবে তাকানো।

দ্বিতীয়ত: তাঁর আয়াতসমূহে চিন্তা ও সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা; তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হলো তাঁর দৃশ্যমান আয়াত বা নিদর্শন আর দ্বিতীয় প্রকার হলো বিবেকগ্রাহ্য শ্রবণযোগ্য আয়াত বা নিদর্শন।

প্রথম প্রকারের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ١٦٤﴾ [البقرة: ١٦٤]

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে, সে নৌকায় যা সমুদ্রে মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তু নিয়ে চলে (রয়েছে নিদর্শনসমূহ এমন জাতির জন্য, যারা বিবেকবান)।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৪] এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ ١٩٠﴾ [ال عمران: ١٩٠]

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নিদর্শন।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯০] এ জাতীয় আয়াত আল-কুরআনে অনেক রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ٢٤﴾ [محمد : ٢٤]

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা- ভাবনা করে না?" [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ ٦٨﴾ [المؤمنون : ٦٨]

“তারা কি এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না?” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৬৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ ٢٩﴾ [ص : ٢٩]

“আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে।” [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৯] এ ধরণের অনেক আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ ٥٣﴾ [فصلت: ٥٣]

“বিশ্বজগতে ও তাদের নিজদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য।” [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৫৩] অর্থাৎ আল-কুরআন সত্য। এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে তার দৃশ্যমান সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখাবেন যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, তিলাওয়াতকৃত এ কুরআন সত্য।

তারপর তিনি তাঁর দেওয়া সাক্ষ্যকেই তার পক্ষ থেকে আগত সকল সংবাদের সত্যতার জন্য যথেষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন, কারণ; তিনি তাঁর রাসূলগণের সত্যতার ওপর যাবতীয় দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অতএব, **আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তাঁর সত্যতার প্রমাণ**, আর আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর রাসূলগণের আয়াতসমূহের সত্যতার ওপর প্রমাণ। তিনি নিজেই সাক্ষী ও সাক্ষ্য সাব্যস্তকৃত (সত্তা)। আর তিনি নিজেই প্রমাণ ও নিজের ওপর প্রমাণবহ। তিনি নিজেই নিজের জন্য দলীল। যেমন কোনো এক বিজ্ঞলোক বলেছেন, 'কীভাবে আমি তাঁর (আল্লাহর) প্রমাণ তালাশ করবো যিনি নিজেই আমার কাছে সব কিছুর জন্য প্রমাণ? তাঁর ব্যাপারে যে দলীলই তালাশ করি, তাঁর অস্তিত্ব সে গুলোর চেয়ে অধিক স্পষ্ট।'

এ কারণেই রাসূলগণ তাদের জাতির কাছে বলেছিলেন,

﴿أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ﴾ [ابراهيم: ١٠]

"(তাদের রাসূলগণ বলেছিল), আল্লাহর ব্যাপারেও কি সন্দেহ?" [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১০] তিনি তো সব জ্ঞাত বিষয়ের চেয়ে অধিক জ্ঞাত, সব দলিলের চেয়ে অধিক স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সব বস্তু তাঁর (আল্লাহর) দ্বারাই চেনা যায়, যদিও তাঁর কাজসমূহ ও হুকুমের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও দলীল-প্রমাণ তালাশের মধ্যেও তাঁকে চেনা যায়।

***

ফায়েদা: উদ্বিগ্নতা ও দুঃখ-কষ্টের দো'আ

মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ ইবন হিব্বানে আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا، قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: بَلَى، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا».

কোনো বান্দা দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় পতিত হলে নিম্নোক্ত দো‘আ বলবে, “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার বান্দা, আপনার এক বান্দার পুত্র এবং আপনার এক বাঁদীর পুত্র। আমার কপাল আপনার হাতে (নিয়ন্ত্রণে), আমার ওপর আপনার হুকুম কার্যকর, আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায়পূর্ণ। আমি আপনার কাছে আপনার প্রতিটি নামের উসিলায় প্রার্থনা করছি, যে নাম আপনি নিজের জন্য নিজে রেখেছেন অথবা আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনার সৃষ্টিজীবের কাউকে আপনি শিক্ষা দিয়েছেন অথবা আপনার নিজের কাছে নিজ গায়েবী জ্ঞানে গোপন রেখেছেন- আপনি কুরআনকে বানিয়ে দিন আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, আমার বক্ষের আলো, আমার দুঃখের অপসারণকারী এবং আমার দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা দূরকারী- তাহলে আল্লাহ তার দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দেন এবং এর পরিবর্তে তিনি আনন্দ ও খুশি দান করেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি এটি

শিখবো? তিনি বললেন, অবশ্যই শিখবে। যে ব্যক্তি এটি শুনবে তার ওপর অত্যাবশ্যকীয় হবে এটি শিখে নেওয়া।”[1]

উপরোক্ত এ গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটি আল্লাহর পরিচিতি, তাঁর তাওহীদ ও ‘উবুদিয়্যাতের যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

- দো‘আকারী তার প্রার্থনা এভাবে শুরু করেছে, (إِنِّي عبدُك ابنُ عبدِكَ ابنُ أَمتِكَ) এতে সে তার পূর্বপুরুষ পিতা, মাতা থেকে শুরু করে আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম পর্যন্ত সকলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এভাবে আল্লাহর সামনে তার তোষামোদ, নম্রতা[2] ও বিনয় প্রকাশ পায়। এতে রয়েছে তার স্বীকৃতি যে, সে তাঁর গোলাম, তার পূর্বপুরুষরাও তাঁর গোলাম। আর দয়া, ইহসানের ক্ষেত্রে মনিবের দরজা ছাড়া গোলামের কোনো উপায় নেই। তার মনিব যদি তাকে উপেক্ষা করে এবং তাকে ছেড়ে দেয় তবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তাকে সাহায্য করার কেউ থাকবে না, কেউ তাকে দয়া করবে না; বরং সে সর্বপ্রকারের ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

---

[1] মুসনাদ আহমাদ, ৬/২৪৬, হাদীস নং ৩৭১২; ইবন হিব্বান, ৩/২৫৩, হাদীস নং ৯৭২, মুহাক্কিক শু‘আইব আরনাঊত বলেছেন, হাদীসের সনদটি সহীহ, সনদের বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী, আর আবু খাইসামা হলেন, যুহাইর ইবন হরব এবং আবু সালমাহ আল-জুহানী হলেন, মূসা ইবন আব্দুল্লাহ। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, সিলসিলাহ সহীহাহ, হাদীস নং ১৯৯।

[2] استخذاءٌ অর্থ অবনত হওয়া, ভেঙ্গে পড়া।

- সে এ স্বীকৃতির মাধ্যমে এটা বলছে যে, আপনার সাহায্য ব্যতীত এক মূহুর্তের জন্যেও আমার কোনো উপায় নেই, আমার এমন কেউ নেই যার কাছে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করবো, আমি যার গোলাম তাকে ব্যতীত অন্যের কাছে আমি আশ্রয় চাইব কীভাবে?

- এতে আরও অন্তর্ভুক্ত করে, ব্যক্তির এ স্বীকৃতি যে, সে তার রবের দ্বারা পরিচালিত, অধীনস্ত, তাঁর আদেশ পালনে আদিষ্ট ও নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য- তিনি তো তার ওপর দাস হিসেবে কর্তৃত্ব করেন, তার নিজের কোনো ইখতিয়ার (ইচ্ছা-স্বাধীনতা) সে চলতে পারে না। কেননা নিজের স্বাধীনতা থাকা দাসের অবস্থা নয়; বরং এটি মনিব ও স্বাধীনের অধিকার। দাসরা তো শুধু 'উবুদিয়্যাত তথা দাসত্ব করবে। তারা আনুগত্যের দাস, আল্লাহর দিকেই সম্পৃক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ عِبَادِى لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌ﴾ [الحجر: ٤٢]

"নিশ্চয় আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই।" [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৪২]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا﴾ [الفرقان: ٦٣]

"আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৩]

আল্লাহর এসব বান্দা ছাড়া বাকীরা (ইচ্ছাকৃত দাস না হয়ে) পরাক্রম ও প্রভুত্বের অধিন হিসেবে দাসত্ব করে। আল্লাহর সাথে এসব লোকের সম্পর্ক ঠিক তেমন, যেমন বিশ্বের যাবতীয় ঘর আল্লাহর মালিকানার দিকে সম্বন্ধ করা হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর সত্যিকার বান্দাদের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ঠিক তেমন, যেমন বাইতুল্লাহিল হারাম কা'বাকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, (সালেহ আলাইহিস সালামের) উঁটকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। জান্নাতের গৃহকে তাঁর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। তাঁর রাসূলের দাসত্বকে তাঁর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا٢٣ ﴾ [البقرة: ٢٣]

“আর আমরা আমাদের বান্দার ওপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿ سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ١ ﴾ [الاسراء: ١]

“পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿ وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبۡدُ ٱللَّهِ يَدۡعُوهُ١٩ ﴾ [الجن: ١٩]

“আর নিশ্চয় আল্লাহর বান্দা যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়াল।” [সূরা আল-জিন, আয়াত: ১৯]

আর হাদীসের বাণী (إِنِّي عبدُك) আমি আপনার বান্দা বা দাস এটি যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার অর্থ দাঁড়াবে: তার চরম দাসত্ব আবশ্যক করে নেওয়া; তার কাছে নতজানু হওয়া, বিনয়ের সাথে তার দাসত্ব করা, তার কাছে প্রত্যাবর্তন করা, তার আদেশ মান্য করা, নিষেধ থেকে বিরত থাকা, তার কাছে সর্বদা প্রার্থনা করা, তার কাছে আশ্রয় চাওয়া, তার কাছে সাহায্য চাওয়া, তার ওপর তাওয়াক্কুল করা, তার কাছেই অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া, ভালোবাসা, ভয় ও প্রত্যাশায় অন্যের সাথে অন্তরকে মিশ্রিত না করা ইত্যাদি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (بيدِك ناصيتي) আমার কপাল আপনার হাতে। বান্দা যখন এ সাক্ষ্য দিবে যে, তার কপাল আল্লাহর হাতে, অনুরূপ সকল বান্দার কপালও একমাত্র আল্লাহর হাতে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পরিবর্তন করেন, তখন তারা এ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না, তিনি ব্যতীত কারো কাছে কিছু আশা করবে না, তারা নিজেদেরকে মনিবের স্তরে নিয়ে যাবে না; বরং তারা নিজেদেরকে দাসের স্তরে নিয়ে যাবে, যে দাস একজনের অধীনে সীমাবদ্ধ, অক্ষম, পরিচালিত, যিনি তাদেরকে পরিবর্তন ও পরিচালনা করেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের এ অবস্থানের সাক্ষ্য দিবে; তার অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন তার রবের কাছেই হওয়া অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যাবে। আর যখন কোনো লোক এ ধরনের সাক্ষ্য দিবে তখন সে আর মানুষের

মুখাপেক্ষী হবে না, তাদের কাছে কোনো আশা-প্রত্যাশাও করবে না; আর এভাবেই তার তাওহীদ, তাওয়াক্কুল ও ‘উবুদিয়্যাত সঠিক হবে।

এ কারণেই হূদ আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে বলেছিলেন,

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٥٦﴾ [هود: ٥٦]

“আমি অবশ্যই তাওয়াক্কুল করেছি আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ওপর, প্রতিটি বিচরণশীল প্রাণীরই তিনি নিয়ন্ত্রণকারী। নিশ্চয় আমার রব সরল পথে আছেন।” [সূরা হূদ, আয়াত: ৫৬]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, (ماضٍ فيّ حُكمُك عدلٌ فيَّ قضاؤك) “আমার ওপর আপনার হুকুম কার্যকর, আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায়পূর্ণ।” রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে হুকুম ও কাযা বা ফয়সালার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। হুকুমের জন্য তিনি (المضَاءَ) কার্যকার এবং (القضاءِ) ফয়সালা এর জন্য (العدلَ) ব্যবহার করেছেন। কেননা আল্লাহর হুকুম দীনি ও শর‘ঈ এবং বৈশ্বিক ও নিয়তি উভয় ধরণের হুকুম অন্তর্ভুক্ত করে। বান্দার ব্যাপারে এ দুধরণের বিধানই বাস্তবায়িত হয়। তার ব্যাপারে এ দুধরণের হুকুম কার্যকর ও বাস্তবায়ন হয়; চাই তা তার ইচ্ছাকৃত হোক অথবা অনিচ্ছাকৃত; কিন্তু সে বৈশ্বিক হুকুমের বিরোধিতা করতে পারে না। অন্যদিকে শরী‘আতের বিধানকে কখনো কখনো অমান্য করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী (أَسألُك بكلِّ اسمٍ) "আমি আপনার কাছে আপনার প্রতিটি নামের উসিলায় প্রার্থনা করছি", এখান থেকে শেষ পর্যন্ত..... তিনি আল্লাহর সমস্ত নামের উসিলায় প্রার্থনা করছেন। সেসব নাম বান্দা জানুক বা না জানুক। আল্লাহর নামের উসিলা দেওয়া তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কেননা এভাবে উসিলা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর সিফাত ও কাজের মাধ্যমে উসিলা দেওয়া; যা তাঁর নামসমূহের অন্তর্নিহিত চাহিদা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী (أَنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري) "আপনি কুরআনকে বানিয়ে দিন আমার হৃদয়ের প্রশান্তি (বৃষ্টি), আমার বক্ষের আলো", এখানে (الرَّبيعُ) অর্থ জমিন উর্বরকারী বৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-কুরআনকে উর্বরকারী বৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন। কেননা কুরআন মানুষের অন্তর জীবিত করে। এমনিভাবে আল্লাহ কুরআনকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন। তিনি পানির সাথে তুলনা করেছেন যে পানি দ্বারা বস্তু জীবিত হয় এবং নূরের সাথে তুলনা করেছেন যে নূরের দ্বারা আলো ও উজ্জলতা প্রকাশ পায়। আল্লাহ এ দু'টিকে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একত্রিত করেছেন,

﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتۡ أَوۡدِيَةُۢ بِقَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيۡلُ زَبَدًا رَّابِيًاۖ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيۡهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبۡتِغَآءَ حِلۡيَةٍ أَوۡ مَتَٰعٖ زَبَدٞ مِّثۡلُهُۥ﴾ [الرعد: ١٧]

“তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এতে উপত্যকাগুলো তাদের পরিমাণ অনুসারে প্লাবিত হয়, ফলে প্লাবন ওপরস্থিত ফেনা বহন করে নিয়ে যায়। আর অলংকার ও তৈজসপত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে তারা আগুনে যা কিছু উত্তপ্ত করে তাতেও অনুরূপ ফেনা হয়।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ১৭]

সুতরাং উপরোক্ত দো‘আয় কুরআনের প্রশান্তির (উর্বরকারী বৃষ্টি) দ্বারা অন্তরকে উজ্জীবিত করা ও বক্ষকে আলোকিত করা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং এখানে জীবন ও আলো একত্রিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الانعام: ١٢٢]

“যে ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছি আলো, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে, সে কি তার মতো যে ঘোর অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে সে বের হতে পারে না?” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২২]

বক্ষ যেহেতু অন্তরের চেয়ে প্রশস্ত সেহেতু বক্ষের অর্জিত আলো অন্তরে ছড়িয়ে পড়ে। কেননা বড় জিনিস থেকে ছোট জিনিসের মধ্যে প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। আবার যেহেতু শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জীবন পুরোটাই অন্তরের জীবন, সেহেতু সেখান থেকে জীবন বক্ষে ছড়িয়ে পড়ে, অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এমন জীবন প্রার্থনা করেছেন যে জীবনের রবী‘ তথা উর্বরকারী বৃষ্টি (প্রশান্তি) আছে, যে প্রশান্তিই জীবনের মূল।

অন্যদিকে দুঃখ, দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা যেহেতু অন্তরের জীবনকে প্রশান্তি দিতে ও একে আলোকিত করতে বাধা দেয়, তাই তিনি কুরআনের দ্বারা এসব দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করতে দো‘আ করেছেন। কেননা কুরআনের দ্বারা এসব দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর হলে সেগুলো আর ফিরে আসে না। আর কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা যেমন, সুস্বাস্থ্য, দুনিয়া, সুনাম-সুখ্যাতি ইত্যাদি দ্বারা সুখ লাভ করলে এগুলো চলে গেলে আবার তার দুঃখ, দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা ফিরে আসে।

অন্তরে আপতিত অপছন্দনীয় বিষয়গুলো যদি অতীতের হয় তখন তাকে ‘হুযন’ তথা দুঃখ বলে, আর ভবিষ্যতের বিষন্নতাকে ‘হাম্ম’ এবং বর্তমানের দুশ্চিন্তাকে ‘গাম’ বলে।

***

ফায়েদা: আল-কুরআনে আগত বিবিধ সম্বোধনের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা

তুমি আল-কুরআনের সম্বোধনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করলে এমন একজন রাজাধিরাজ পাবে যিনি সবকিছুর মালিক, তাঁর জন্যই সমস্ত

প্রশংসা, সব কিছুর লাগাম (পরিচালনার রশি) তাঁরই হাতে, সবকিছুর মূল তাঁরই থেকে, তাঁর কাছেই সবকিছু ফিরে যাবে, তাঁর মালিকানায় কোনো কিছুই গোপন থাকে না, বান্দার অন্তরের খবর তিনি জ্ঞাত, তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি অবগত, তাঁর সম্রাজ্য পরিচালনায় তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তিনি সবকিছু শুনেন, দেখেন, দান করেন, আবার কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকেন, সৎকাজের বিনিময় সাওয়াব দান করেন, অন্যায়ের কারণে শাস্তি প্রদান করেন, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, আবার যাকে খুশি অপমানিত করেন, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেন, রিযিক দান করেন, জীবিত করেন, মৃত্যু দান করেন, সবকিছু পরিমাণ মতো সৃষ্টি করেন, তাদের তিনি ফয়সালা দান করেন ও তিনিই সবকিছু সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন।

ছোট-বড়, সূক্ষ্ম-অতিসূক্ষ্ম সবকিছুই তাঁর কাছ থেকেই আসে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যায়, তাঁর অনুমতি ব্যতীত একটি অণুও নড়াচড়া করতে পারে না, গাছের একটি পাতাও তাঁর অবগতি ব্যতীত ঝরে পড়ে না।

তিনি তাঁর অলীদেরকে ভালো কাজ ও সুন্দর গুণাবলীর জন্য প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে তাঁর শত্রুদেরকে মন্দ কাজ ও অসৎ গুণের জন্য নিন্দা করেছেন। তিনি কুরআনে অনেক উপমা পেশ করেছেন, নানাভাবে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, তাঁর শত্রুর দ্বিধা-সংশয়ের ব্যাপারে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন, সত্যবাদীকে তিনি সত্যায়ন করেছেন ও মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছেন। তিনি কুরআনে হক কথা বলেছেন, হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, জান্নাতের দিকে আহ্বান

করেছেন, জান্নাতের গুণাবলী, এর সৌন্দর্য ও নি'আমত বর্ণনা করেছেন, অন্যদিকে জাহান্নাম থেকে সাবধান করেছেন, এর আযাব, ভয়ঙ্করতা ও দুঃখ কষ্টের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বান্দাকে সর্বদিক থেকে তাঁর প্রতি অভাবী, অসহয় ও মুখাপেক্ষীর কথা স্মরণ করে দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্যও তাদের কোনো উপায় নেই, আবার তিনি একথাও স্মরণ করে দিয়েছেন যে, তিনি বান্দা ও সমস্ত সৃষ্টির অমুখাপেক্ষী, তিনি সবদিক থেকে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী, তাঁর দয়া ও রহমত ব্যতীত কেউ বিন্দু পরিমাণ বা তারচেয়ে কম কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, আবার তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও হিকমত ব্যতীত কেউ অণু পরিমাণ বা তারচেয়েও কম অকল্যাণ পাবে না।

আল-কুরআনে মানুষের অন্তর যখন এমন একজন মালিক-রাজাধিরাজের সন্ধান পাবে যিনি একাধারে মহান মালিক, রহীম, দানশীল, সুন্দর- তখন কীভাবে তাঁকে ভালোবাসবে না? তাঁর নৈকট্য লাভে কেন প্রতিযোগিতা করবে না? তাঁর হৃদ্যতা ও কোমলতা লাভে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করবে না? কেনই-বা তিনি তার কাছে সর্বাধিক প্রিয়জন হবে না? সবকিছুর সন্তুষ্টি বাদে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টিই কেন একমাত্র লক্ষ্য হবে না? কেন সে তাঁর স্মরণে অনুরক্ত হবে না? তখন কেনই-বা তাঁর ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব তার খাদ্য, শক্তি ও নিরাময় হবে না? কেননা সে তাঁর ভালোবাসা, আবেগঘনতা ও ঘনিষ্ঠতা হারালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, মহাক্ষতিগ্রস্ত হবে। তখন তার জীবনের কোন মূল্যই থাকবে না।

***

ফায়েদা: সূরা আত-তাকাসুরে গভীর দৃষ্টিপাত ও চিন্তা-গবেষণা

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١ حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ ٢ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٣ ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ٤ كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُونَ عِلۡمَ ٱلۡيَقِينِ ٥ لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ ٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ ٧ ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨﴾ [التكاثر: ١، ٩]

“প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাক্ষাৎ করবে। কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানবে, তারপর কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। কখনো নয়, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে! তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে; তারপর তোমরা তা নিশ্চিত চাক্ষুষ দেখবে। তারপর সেদিন অবশ্যই তোমরা নি‘আমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।” [সূরা আত-তাকাসুর, আয়াত: ১-৯]

এ সূরা আল্লাহর অঙ্গিকার, ভীতিপ্রদর্শন ও হুমকিপ্রদানের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জ্ঞানীর জন্য উপদেশ গ্রহণের জন্য এগুলোই যথেষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, (أَلۡهَىٰكُمُ) তোমাদেরকে এমনভাবে ব্যস্ত রেখেছে যে সে ব্যাপারে তোমাদের কোনো ওযর গ্রহণ করা হবে না; কেননা (ألهى عن الشيء) এর অর্থ কোনো কিছু থেকে অমনোযোগী থাকা। আর এটি ইচ্ছাকৃত করলে অন্যায় বলে বিবেচিত হবে, কেননা মূল বস্তু থেকে অমনোযোগী না থাকতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট।

আর যদি অনিচ্ছাকৃত হয়ে যায় তবে তার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে, যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (الخميصة) তথা কারুকার্য খচিত চাদরের ব্যাপারে বলেছিলেন,

«فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي».

“এটা তো আমাকে সালাত থেকে অমনোযোগী করে দিচ্ছিল।”[3] এটি একধরণের বিস্মৃতি।

অনুরূপ অন্য হাদীসে এসেছে, মুনযির ইবন আবূ উসাইদ জন্মগ্রহণ করলে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসলে তাকে তাঁর উরুর ওপর রাখা হয়। তখন নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

«فَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ».

“এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চা ব্যতীত তার সামনের কোনো জরুরী কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।”[4] অর্থাৎ অমনোযোগী হওয়া। যেমন বলা হয় (لَـهَا بالشيءِ، أي: اشتغلَ به) যখন কোনো নিয়ে ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়। আবার বলা হয় (لَـهَا عنه: إذا انصرفَ عنه) যখন কোনো বিষয় মারাত্মকভাবে উপেক্ষা করা হয়।

[3] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫৬।

[4] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৯১।

অন্তরের বিনোদনের জন্য (اللهوُ) ‘লাহও’ ব্যবহার হয় আর অঙ্গ-প্রতঙ্গের বিনোদনের জন্য (اللعب) ‘লা‘ব’ ব্যবহার হয়। এ কারণেই এ দু’টি শব্দ একত্রে ব্যবহার হয়। আর তাই আল্লাহর বাণী, (أَلۡهَىٰكُمُ) এটি (شغلكم) (তোমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে) এ কথার চেয়ে বেশি নিন্দাসূচক; কেননা কাজ সম্পন্নকারী অনেক সময় অঙ্গের দ্বারা কাজ করে; কিন্তু তার অন্তর অমনোযোগী নয়। অতএব, (اللهوُ) হলো অমনোযোগী হওয়া, উপেক্ষা করা। আর (التكاثر) হলো বেশি অধিক। অর্থাৎ পরস্পর প্রাচুর্য লাভের জন্য বেশি বেশি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা।

ধন-সম্পদ, সুনাম-সুখ্যাতি, যশ-ক্ষমতা, নারী, কথা, জ্ঞান ইত্যাদি সব কিছুতেই আধিক্য হতে পারে। বিশেষ করে যখন এগুলোর প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও বেশি পরিমাণে জমা করা হয়। অধিক বই-পুস্তক, অধিক গ্রন্থ রচনা, অধিক মাস’আলা ও এর শাখা-প্রশাখা বের করা ইত্যাদি সব কিছুতেই আধিক্য হতে পারে।

অন্যের তুলনায় অধিক ধন-সম্পদের প্রত্যাশা করাও (التكاثر)। এ ধরণের করা নিন্দনীয়; তবে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে অধিক সম্পদের অধিকারী হওয়াতে দোষ নেই। অতএব, (التكاثر) হলো অধিক ধন-সম্পদ ও কল্যাণের অধিকারী হতে প্রতিযোগিতা করা। সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবন শিখখীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু‘ সূত্রে বর্ণনা করেন,

﴿أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١﴾ [التكاثر: ١] «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ».

"প্রাচুর্যের (সম্পদের) আধিক্য মোহ তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে।" [সূরা আত-তাকাসুর, আয়াত: ১] আদম সন্তান বলে, আমার মাল আমার মাল। অথচ তুমি যা সাদকা করে আল্লাহর কাছে জমা করে রাখলে বা খেয়ে শেষ করে দিলে বা পরিধান করে পুরান করে দিলে তাছাড়া তোমার মাল বলতে কিছু আছে কী?"[5]

***

ফায়েদা: দুনিয়ার হাকীকত

দুনিয়া হলো, পতিতা নারীর মতো যে একজন স্বামীর সাথে স্থির থাকে না; বরং একাধিক স্বামী তালাশ করে, তাদের সাথে আরো বেশি ভালো থাকার আশায়। ফলে সে বহুচারিনী হওয়া ব্যতীত সন্তুষ্ট থাকে না।

কবি দুনিয়ার উপমা দিয়ে বলেছেন,

আমি দুনিয়ার সৌন্দর্য ও তার কাজের মাঝে পার্থক্য করেছি। কেননা সৌন্দর্য অসৌন্দর্যের সাথে পূর্ণ হয় না।।

[5] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৫৮।

দুনিয়া আমাদের সাথে শপথ করেছিল যে, সে কখনও আমাদের অঙ্গিকারের খিয়ানত করবে না।। কিন্তু আমাদের সাথে তার শপথ এমনই যেন সে কখনই তার ওয়াদা পূরণ করবে না।

দুনিয়ার পিছনে ঘোরা হলো হিংস্র জানোয়ারের[6] চরণভূমিতে বিচরণ করা, এতে সাঁতার কাটা মানে কুমিরের পুকুরে সাঁতার কাটা, দুনিয়ার দ্বারা আনন্দিত হওয়া মানে নিশ্চিত দুশ্চিন্তায় পতিত হওয়া, এর ব্যথা-বেদনাগুলো এর স্বাদ থেকেই সৃষ্টি হয়, এর দুঃখ-কষ্টগুলো এর আনন্দ থেকে জন্ম নেয়।

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তরা যখন দুনিয়ার জীবনের সঠিক মূল্য ও এর ক্ষণস্থায়িত্বতা বুঝতে সক্ষম হলো তখন তারা পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য তাদের প্রবৃত্তিকে নিঃশেষ করে দিল। যখন তারা গাফেলতির নিদ্রা থেকে জেগে উঠতে সক্ষম হলো তখন বেকার অবস্থায় শত্রু তাদের থেকে যেটুকু লুটে কেড়ে নিয়েছিল অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে তারা সেগুলো পুনরুদ্ধার করে নিল। যখনই তাদের চলার পথ দীর্ঘ মনে হতে লাগতো তখনই তারা উদ্দিষ্ট গন্তব্যের সঠিক মূল্যমানের কথা স্মরণ করতো ফলে দূরবর্তী সবকিছু তাদের কাছে নিকটবর্তী মনে হতো। আবার যখন দুনিয়ার জীবন তাদেরকে তেতো করে ফেলতো তখনই

---

[6] (مَسْبَعة) হলো যেখানে অনেক হিংস্র জানোয়ার থাকে। দেখুন, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ (سبع)।

তাদের কাছে মধুময় হয়ে দেখা দিত পরকালের স্মরণ; যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿هَٰذَا يَوۡمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ۝١٠٣﴾ [الانبياء: ١٠٣]

"এটাই তোমাদের সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৩]

কবি বলেছেন,

এমন বহু কাফেলা রয়েছে যারা সফর করতে শুরু করেছে, আর রাত তার আধাঁর বিছিয়ে দিয়েছে ধুলায় ধূসরিত অবস্থায়, ওদিকে প্রভাত দরজায় দণ্ডায়মান।...

***

পরিচ্ছেদ: সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো তুমি তাঁকে চিনো; তারপরও তাঁকে ভালোবাসো না। তাঁর আহ্বান শোনো; কিন্তু তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে বিলম্ব করছ। তাঁর সাথে লেনদেন করলে অনেক মুনাফা হবে একথা জানো; অথচ তুমি অন্যের সাথে লেনদেন করছ। তাঁর রাগের পরিমাণ তুমি জানো; অথচ তাঁর থেকে বিমুখ থাকছ। তাঁর অবাধ্যতার চরম শাস্তি ভোগ করছ; অথচ তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর ভালোবাসা তালাশ করছ না। তুমি অন্যের ব্যাপারে আলোচনা করে অন্তরের রস আস্বাদন

করো; অথচ তাঁর যিকর ও মুনাজাতের মাধ্যমে অন্তরকে প্রশান্ত করতে তুমি পাগলপনা হচ্ছ না। তিনি ব্যতীত অন্যের সাথে তোমার অন্তর সম্পৃক্ত করে আযাবের স্বাদ আস্বাদন পাচ্ছ; কিন্তু অন্যের কাছ থেকে পালায়ন করে তাঁর নি'আমতের দিকে এগিয়ে আসছ না এবং তাঁরই দিকে ফিরে আসছ না।

এর চেয়েও বেশি আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তুমি অবশ্যই জানো যে তাঁকে তোমার লাগবেই, তুমি তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী, অসহায়; অথচ তুমি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে আছো। আর যা তোমাকে তাঁর থেকে দূরে রাখবে তুমি তারই অভিমুখী!

***

ফায়েদা: হারাম কাজে পতিত হওয়ার কারণসমূহ

বান্দা দু'টি কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হয়। সে কারণ দু'টি হচ্ছে:

প্রথমত: আল্লাহর ব্যাপারে তার মন্দ ধারণা এবং তার এ রূপ ধারণা যে, সে যদি তাঁর যথাযথ আনুগত্য করে, তাঁর অনুকরণ-অনুসরণ করে তাহলে তিনি এর চেয়ে উত্তম জিনিস হালাল হিসেবে তাকে দিবেন না।

দ্বিতীয়ত: সে এ সম্পর্কে জানে এবং একথাও জানে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হারাম বস্তু বর্জন করবে আল্লাহর এর বিনিময় উত্তম

জিনিস তাকে দান করবেন; কিন্তু তার প্রবৃত্তি তার ধৈর্যের ওপর বিজয় লাভ করেছে এবং তার বিবেকের ওপর তার প্রবৃত্তি প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে সে হারামে পতিত হয়েছে।

প্রথম প্রকারে তারাই পতিত হয় যারা জ্ঞানে দুর্বল আর দ্বিতীয় প্রকারে তারাই পতিত হয় যারা বিবেক ও দূরদৃষ্টিতে দুর্বল।

***

পরিচ্ছেদ: জলে-স্থলে ফিতনা- ফ্যাসাদ প্রকাশ

কীভাবে ব্যক্তি নিরাপদ থাকবে, তার স্ত্রী আছে, অথচ সে তার প্রতি দয়াশীল নয়, ছেলে-সন্তান আছে, কিন্তু তারা তাকে মান্য করে না; প্রতিবেশী আছে, কিন্তু তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায় না; বন্ধু আছে, কিন্তু হিতৈষী নয়; অংশীদার আছে, কিন্তু ইনসাফকারী নয়; শত্রু আছে, যে তার শত্রুতা পোষণ থেকে নিরস্ত থাকে না; নফসে আম্মারা বা খারাপ নির্দেশকারীনী আত্মা রয়েছে, যে শুধু অন্যায়ের আদেশ দেয়; দুনিয়া রয়েছে তার জন্য সুশোভিত হয়ে; প্রবৃত্তি রয়েছে যে তাকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর, খাম-খেয়ালী ও মনবাসনা রয়েছে তার ওপর বিজয়ী হয়ে; তার আছে প্রতিশোধস্পৃহ ক্রোধ; আরও রয়েছে শয়তান যে খারাপকে সুসজ্জিতকারীরূপে দেদীপ্যমান; আরও রয়েছে দুর্বলতা, যা তাকে কাবু করে ফেলেছে। অতঃপর আল্লাহ যদি তার দায়িত্ব নেন ও তাকে তাঁর দিকে টেনে নেন তাহলেই কেবল এসব কিছুর ওপর সে বিজয় লাভ করতে পারবে। আর আল্লাহ যদি তাকে ছেড়ে দেন, তার

নিজের দায়িত্ব নিজেকে অর্পণ করেন তাহলে উপরোক্ত ফ্যাসাদগুলো একত্রিত হয়ে তার ওপর চড়াও হবে, ফলে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

মানুষ যখন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং এ দু'টি দ্বারা ফয়সালা করবে না, তারা যখন বিশ্বাস করবে এ দু'টির ফয়সালার ওপর নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তা নেই, তারা নিজেদের মতবাদ, কিয়াস, ইসতিহসান, শায়খদের মতের দিকে ঝুঁকবে, তখন তাদের স্বভাবজাতের মধ্যে ফ্যাসাদ, অন্তরে অন্ধকার, বুঝ শক্তিতে পঙ্কিলতা ও বিবেকে ধ্বংস আপতিত হবে।

এসব কিছু ব্যাপক আকারে আপতিত হয়েছে এবং তাদের ওপর এগুলো প্রাধান্য বিস্তার করেছে; এমনকি শিশুরাও এসবের ওপর প্রতিপালিত হয়েছে আর বয়স্করা এর ওপরই বুড়ো হয়েছে, ফলে তারা আর এগুলোকে অন্যায় মনে করছে না। এরপরে তাদের ওপর আপতিত হয়েছে অন্য প্রশাসন, যাতে সুন্নাতের জায়গায় বিদ'আত, বিবেকের বদলে প্রবৃত্তি, দূরদর্শিতার পরিবর্তে খাম-খেয়ালী, হিদায়াতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতা, সৎকাজের পরিবর্তে অসৎকাজ, জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞতা, ইখলাসের পরিবর্তে লৌকিকতা, হকের পরিবর্তে বাতিল, সত্যের পরিবর্তে মিথ্যা, উপদেশের পরিবর্তে চাটুকারিতা, ন্যায়বিচারের পরিবর্তে যুলুম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ফলে ক্ষমতা ও প্রাধান্য এসব কিছুরই হয়ে গেছে। আর যারা এসব অন্যায় কাজ করছে তাদের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি

নিবদ্ধ হয়েছে, অথচ ইতোপূর্বে অবস্থা ছিল এর সম্পূর্ণ উল্টো। তখন ভালো কাজে সম্পৃক্ত লোকদের প্রতিই ছিল মানুষের দৃষ্টি।

সুতরাং যখন তুমি দেখবে এসব খারাপ বিষয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে ধাবিত হচ্ছে, এসবের ঝাণ্ডা স্থাপিত হয়েছে, এর সৈনিকেরা সংগঠিত হয়েছে, তখন জমিনের নিম্নাংশ অর্থাৎ কবর (আল্লাহর কসম) জমিনের উপরিভাগের চেয়ে উত্তম, পাহাড়ের চূড়া[7] সমতল ভূমির চেয়ে উত্তম, মানুষের সাথে মিলিত হওয়ার চেয়ে হিংস্র পশুর সাথে মেলা-মেশা অধিক নিরাপদ।

জমিন প্রকম্পিত হচ্ছে, আসমান অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, পাপীদের যুলুমের কারণে জলে-স্থলে ফ্যাসাদ প্রকাশ পাচ্ছে, বরকত উঠে যাচ্ছে, কল্যাণ কমে যাচ্ছে, জীব-জানোয়ার কৃশকায় হয়েছে, জালিমদের পাপের কারণে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে, মারাত্মক অন্যায় ও হিংস্র কর্মকাণ্ডের কারণে দিনের আলো ও রাতের অন্ধকার কান্না করে যাচ্ছে, অধিক খারাপ কাজ, অন্যায় ও বীভৎসতা ছড়িয়ে পড়ার কারণে সম্মানিত লেখক ফিরিশতারাও আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে।

আল্লাহর শপথ, এগুলো এমন আযাবের সতর্কতা, যে আযাবের মেঘমালা একত্রিত হয়েছে, এমন মুসিবতপূর্ণ রাতের আগমনবার্তা শোনাচ্ছে যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং খাঁটি তাওবার মাধ্যমে এ পথ থেকে ফিরে আসো, যতক্ষণ তাওবা করা সম্ভব ও তার দরজা খোলা রয়েছে।

---

[7] قلل الجبال পাহাড়ের চূড়া। লিসানুল আরব, মাদ্দাহ (قلل)।

মনে করো তুমি এমন এক দরজার সম্মুখে আছো যে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, এমন ঋণের বিষয়ে বন্ধক রেখেছ যা নিঃশেষ হয়ে গেছে, এমন ডানার সাহায্য নিচ্ছ যা আটকে গেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَسَيَعۡلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَيَّ مُنقَلَبٖ يَنقَلِبُونَ ٢٢٧﴾ [الشعراء : ٢٢٧]

“আর যালিমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কোন প্রত্যাবর্তন স্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ২২৭]

***

পরিচ্ছেদ: অনুতপ্ত হওয়ার আগেই অনুতপ্ত হও

তোমার নিজকে আজই ক্রয় করে নাও, বাজার বসেছে, মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, পণ্যসামগ্রী খুবই সস্তা। এ বাজারে ও এর পণ্য-সামগ্রিতে এমন একদিন আসবে যখন তুমি অল্প বা বেশি কিছুই পাবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلتَّغَابُنِ ٩﴾ [التغابن : ٩]

“ঐ দিনই হচ্ছে লাভ-ক্ষতির দিন।” [সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ ٢٧﴾ [الفرقان: ٢٧]

“আর সেদিন যালিম নিজের হাত দু’টো কামড়াবে।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২৭]

কবি বলেছেন,

তুমি যদি তাকওয়ার পাথেয় সংগ্রহ না করে পরপারে যাত্রা করো, দেখবে হাশরের দিনে অন্যরা পাথেয় সংগ্রহ করে সেদিন উপস্থিত হয়েছে।।

তখন তুমি অনুতপ্ত হবে কেনো তুমি তাদের মতো হলে না, তারা যেভাবে রসদ-সামগ্রী নিয়ে এসেছে কেনো তুমি সেসব রসদ নিয়ে এলে না।।

ইখলাস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের অনুসরণ ব্যতীত আমল হলো সে মুসাফিরের কর্মের ন্যায়, যিনি মাটি দ্বারা থলে ভর্তি করে অযথা ভারী করে বহন করছে যা তার কোনো উপকারে আসে না।

যখন তুমি অন্তরে দুনিয়ার দুশ্চিন্তা ও এর বোঝা ভর্তি করে রাখবে আর এর আসল খাদ্য ও জীবন (কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির ইত্যাদি) প্রদান করার ব্যাপারে অলসতা করবে, তখন তোমার উদাহরণ সে মুসাফিরের ন্যায় যিনি তার বাহনের পশুর পিঠে এর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে এবং তাকে খাদ্য-পানীয়ও দিচ্ছে না, তাহলে অতি দ্রুতই সে দেখবে যে, তার বাহন ঠায় দাঁড়িয়ে গেছে।

কবি বলেছেন,

বিক্ষিপ্ত সংকল্পের আধিকারী ব্যক্তি তার জীবন দিশেহারায় ব্যয় করে, তার নেই কোনো সফলতা, নেই কোনো ব্যর্থতা।

***

কায়েদা: তাওহীদের উপকারিতা

তাওহীদ তার শত্রু ও মিত্র সবার জন্য বিপদের আশ্রয়স্থল। শত্রুকে দুনিয়ার বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ ٦٥﴾ [العنكبوت: ٦٥]

“তারা যখন নৌযানে আরোহন করে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে স্থলে পৌঁছে দেন, তখনই তারা শির্কে লিপ্ত হয়।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৫]

অন্যদিকে তাওহীদ তার অনুসারীদেরকে দুনিয়ার বালা-মুসিবত ও আখিরাতের মহাবিপদ থেকে রক্ষা করবে। এ কারণেই ইউনুস আলাইহিস সালাম যখন মাছের পেটে মহাবিপদে পড়েছিল তখন এ তাওহীদের আশ্রয় নিয়েছিল, ফলে আল্লাহ সেসব অন্ধকার থেকে তাকে রক্ষা করেছিলেন।

আর রাসূলদের অনুসারীগণ ভীত হয়ে এ তাওহীদের আশ্রয় নিয়েছিল, তখন দুনিয়াতে মুশরিকরা তাদেরকে যে আযাব দিচ্ছিল তা থেকে এ তাওহীদের দ্বারাই তারা রক্ষা পেয়েছিল, আর তাদের জন্য পরকালে তো আল্লাহ মহাপ্রতিদান তৈরি করে রেখেছেনই।

ফির‘আউনের ধ্বংস ও ডুবে যাওয়া স্বচক্ষে অবলোকন করার সময় তার তাওহীদ কোনো উপকারে আসে নি। কেননা স্বচক্ষে ধ্বংস দেখার সময় ঈমান আনয়ন করলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

বান্দার ব্যাপারে এটি আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। দুনিয়ার কঠিন বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা পেতে তাওহীদের মতো অন্য কিছু নেই। এ কারণেই তাওহীদের মাধ্যমে বিপদমুক্তির দো‘আ করা হয়। যুননূন ইউনুস আলাইহিস সালামের দো‘আ, তা যখনই কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি পড়ে আল্লাহ তাকে তা থেকে উদ্ধার করেন, সেটাও তাওহীদেরই দো‘আ ছিল। মানুষকে মহাবিপদে নিক্ষেপকারী হিসেবে শির্কের কোনো জুড়ি নেই। আর তাওহীদ ব্যতীত শির্কের এ মহাবিপদ থেকে মুক্তকারীও কিছু নেই। তাওহীদ হলো আল্লাহর সৃষ্টিকুলের জন্য ভীতি দূরকারী, আশ্রয় প্রদানকারী, দুর্গ ও সাহায্যকারী। আর আল্লাহই একমাত্র তাওফীক দানকারী।

***

ফায়েদা: সর্বাধিক সুখময় বিষয়

সুখ-শান্তি ভালোবাসার অনুগামী। ভালোবাসার শক্তিতে সুখ শক্তিশালী হয় এবং ভালোবাসার দুর্বলতায় সুখ দুর্বল হয়। ভালোবাসার টান ও আকাঙ্ক্ষা যত শক্তিশালী হবে সুখের স্বাদও তত শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ হবে। অন্যদিকে ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষা (যাকে ভালোবাসবে, যার সাথে সাক্ষাতের আশা করবে তার) পরিচিতি লাভ ও জানার অনুগামী হয়। (যাকে ভালোবাসবে তার সম্পর্কে) জ্ঞান যত বেশি লাভ করবে তার

ভালোবাসা তত পূর্ণতা পাবে। অতএব, পূর্ণ নি‘আমত যেমন আখিরাতে লাভ হবে, তেমনি পরিপূর্ণ স্বাদ-সুখ পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও ভালোবাসার মাধ্যমে অর্জিত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর, তাঁর নামসমূহ ও সিফাতের ওপর ঈমান আনয়ন করেছে, এর দ্বারাই সে আল্লাহর পরিচিতি লাভ করেছে সেই তাকে সর্বাধিক ভালোবাসতে পেরেছে। আর তাঁর কাছে পৌঁছা, তাঁর নিকটবর্তী হওয়া, তাঁর চেহারা দেখা ও তাঁর কথা শোনার স্বাদ সে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

তার রবের পরিচিতি লাভের এ মহান নি‘আমতের তুলনায় অন্য সকল সুখ, নি‘আমত, আনন্দ ও প্রফুল্লতা সমুদ্রের এক ফোটা পানির তুল্য। সুতরাং যার সামান্যতম জ্ঞান আছে সে মহাকালের চিরস্থায়ী সুখের ওপর কীভাবে ক্ষণস্থায়ী, নগণ্য ও দুঃখ-কষ্ট সম্পন্ন সুখকে প্রধান্য দিবে?!

বান্দার পূর্ণতা কেবল ইলম ও ভালোবাসা এ দু’শক্তি অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়। আর সর্বোত্তম ইলম হলো আল্লাহকে জানার জ্ঞান এবং সর্বোচ্চ ভালোবাসা হলো তাঁকে ভালোবাসা। এ দুয়ের পূর্ণতা অনুসারে ব্যক্তির সুখের পূর্ণতা লাভ হয়। আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী।

***

ফায়েদা: প্রশংসিত বন্দীশালা

আল্লাহ ও পরকালকে অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি দু’ প্রকার কয়েদখানায় নিজেকে আবদ্ধ না করা ব্যতীত তা অর্জন করতে সমর্থ হবে না। আল্লাহকে পাওয়া ও তাঁর চাওয়ার কাছে নিজের মন-প্রাণকে কয়েদ

করে রাখা, তিনি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ঔৎসুক হওয়া থেকে বিরত রাখা এবং নিজের রসনাকে অনর্থক কথাবার্তা থেকে নিরস্ত রাখা। আর আল্লাহর যিকর ও যেসব কাজে ঈমান ও তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পায় সেসব কাজে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা। গুনাহ ও প্রবৃত্তির কামনা থেকে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখা এবং ফরয ও নফল কাজে নিজেকে রুদ্ধ করে রাখা। অতএব, তার রবের সাথে সাক্ষাত হওয়া ব্যতীত তার এ কারাবদ্ধতা থেকে মুক্তি মিলবে না। আর যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন জেলখানা থেকে চিরমুক্তি লাভ করে প্রশস্ত, মুক্ত ও পবিত্র জান্নাতে অবস্থান করবে।

বান্দা যখন এ দু'টি বন্দীশালায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না এবং এ কারাগার থেকে পালিয়ে প্রবৃত্তির উম্মুক্ত আকাশে বিচরণ করবে তখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে লাঞ্ছনাদায়ক কারাগারে আবদ্ধ থাকবে। অতএব, বান্দা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে হয়ত বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভ করবে (জান্নাতে যাবে) অথবা বন্দীশালায় (জাহান্নামে) যাবে। আল্লাহর কাছেই তাওফীক কামনা করছি।

***

অপরিসীম ফায়েদা: আল্লাহর তাকওয়া অর্জন ও সচ্চরিত্র একত্রীকরণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জান্নাতে প্রবেশের বড় মাধ্যম হিসেবে) আল্লাহর তাকওয়া অর্জন ও সচ্চরিত্রকে একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন; কেননা আল্লাহর তাকওয়া বান্দা ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক

ঠিক করে আর সুন্দর ব্যবহার বান্দা ও সৃষ্টির মাঝে সম্পর্ক সুন্দর করে। অতএব, আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন তার জন্য আল্লাহর ভালোবাসাকে আবশ্যক করে তুলে আর সচ্চরিত্রতা মানুষকে ভালোবাসতে আহ্বান করে।

***

ফায়েদা: আল্লাহর দিকে যাবার পথ

- বান্দা এবং আল্লাহ ও জান্নাতের মাঝে একটি সেতু রয়েছে যা পার হতে দু'টি পদক্ষেপের প্রয়োজন। এক পদক্ষেপ তার নিজের নাফসের ব্যাপারে, অপরটি আর সৃষ্টির ব্যাপারে। সুতরাং সে নিজের নফসের চাহিদার পতন ঘটাবে, তার ও মানুষের মাঝে সেটার চাহিদা বাতিল করে দিবে। আর মানুষের কাছে চাহিদার পতন ঘটাবে, তার মাঝে ও আল্লাহর মানুষের অনুপ্রবেশ বাতিল করবে। সুতরাং সে কেবল তার দিকেই তাকায় যে তাকে আল্লাহ ব্যাপারে জানিয়েছে এবং যে পথ শুধু আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়েছে।

- আল্লাহর দিকে যাবার পথ সন্দিহান ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের জন্য নয়; এ পথ দৃঢ় বিশ্বাসী ও ধৈর্যশীল লোকদের দ্বারা বিনির্মিত। তারা এ পথের ওপর নিশানের ন্যায় দৃঢ়ভাবে অবিচল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ٢٤﴾ [السجدة: ٢٤]

“আর আমরা তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমাদের আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।” [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ২৪]

***

কায়েদা: মৃত্যুর সময় ইখলাসের কালেমা উচ্চারণের ফযীলত

মৃত্যুর সময় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য দেওয়ার দ্বারা গুনাহখাতা মাফ হওয়া ও পাপ বিনষ্ট হওয়ার বিরাট প্রভাব রয়েছে। কেননা এটি দৃঢ় বিশ্বাসী বান্দার সাক্ষ্য, যিনি এ কালেমার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝেন। এমন অবস্থায় তিনি এ কালেমার উচ্চারণ করলেন যখন তার প্রবৃত্তি মরে গেছে, তার অবাধ্য আত্মা বিনম্র হয়ে গেছে, অস্বীকার ও বিরোধিতার পরে বশীভূত হয়েছে, বিমুখ হওয়ার পরে এগিয়ে এসেছে, নিজেকে সম্মানিত ভাবার পরে অপদস্থ হয়েছে। সে আত্মা থেকে দুনিয়ার লোভ-লালসা ও দুনিয়া প্রাপ্তির প্রত্যাশা মিটে গিয়েছে, তার রব, সৃষ্টিকর্তা ও সত্যিকারের মাওলার সামনে নিজেকে নগণ্য ও ছোট মনে করেছে, তাঁর অনুগ্রহ, মাগফিরাত ও রহমতের সবচেয়ে বেশি আশা করেছে। সে আত্মা শির্কের যাবতীয় উপায়-উপকরণমুক্ত হয়ে ও শির্ককে বাতিল সাব্যস্ত করে তাওহীদকে নিরঙ্কুশ ও নির্ভেজাল করেছে। ফলে সে অন্তর এসব বিতর্কিত জিনিস থেকে ঝামেলামুক্ত হয়েছে। তখন তার অন্তরে সমস্ত চিন্তা-চেতনা যোগ হয়েছে আল্লাহর কাছে চলে যাওয়া ও তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করার। ফলে বান্দা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে

প্রত্যাবর্তন করতে মনোনিবেশ করেছে। তার অন্তর, রূহ ও চিন্তা-ভাবনা সব কিছু নিয়ে আল্লাহর সমীপে আগমন করেছে, সে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তার গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে।

বান্দার কালেমা শাহাদাহ যদি সুস্থ থাকাবস্থায় এভাবে অর্জিত হতো তবে সে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে বিমুখ হতো, মানুষ থেকে পালিয়ে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করত এবং অন্য সব কিছু থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর সাহচর্যের প্রতি ধাবিত হতো; কিন্তু (ইতোপূর্বে সুস্থ অবস্থায়) সে তো প্রবৃত্তি, দুনিয়ার ভালোবাসা ও এর উপকরণ বোঝাইকৃত অন্তর দ্বারা কালেমা শাহাদাহ উচ্চারণ করেছে, তার অন্তর দুনিয়া অন্বেষণে পরিপূর্ণ ছিল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে প্রার্থনাকারী ছিল। অতএব, মৃত্যুর সময় যেভাবে বান্দার অন্তর সবকিছু থেকে খালি হয় পূর্বে (সুস্থাবস্থায়) যদি সেভাবে খালি হতো, তাহলে তার অন্তরের জন্য ভিন্ন সংবাদ (জান্নাতের সুসংবাদ) থাকতো, তার জীবন হতো পশুর জীবনের চেয়ে ভিন্নতর। আল্লাহ একমাত্র সাহায্যকারী।

***

ফায়েদা: তুমি তোমার নিজের কতটুকু মালিক?

বান্দা তার নিজের ব্যাপারে কতটুকুই বা মালিক? তার কপাল তো আল্লাহর হাতে, তার নফসও আল্লাহর হাতে, তার কলবও আল্লাহ দু আঙ্গুলের মাঝে, তিনি যেভাবে খুশি সেভাবে পরিবর্তন করেন। তার জীবন, মরণ, সুখ-সৌভাগ্য, দুঃখ-বেদনা, চলা-ফেরা, স্থিরতা, কথা-বার্তা,

কাজ-কর্ম সবকিছুই তাঁর হাতে, তাঁর অনুমতিক্রমে ও ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। তাঁর অনুমতি ব্যতীত একটি বারও সে নড়াচড়া করতে সক্ষম হয় না, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত সে কোনো কাজই করতে পারে না?!

সে যদি নিজেকে নিজের কাছে সমর্পণ করে তাহলে সে নিজের অক্ষমতা, বাড়াবাড়ি, গুনাহ ও ভুল-ক্রটির দিকে অর্পণ করবে; আর যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে নিজেকে অর্পণ করে তাহলে সে এমন একজনের কাছে নিজেকে অর্পণ করল যে কোনো উপকার, ক্ষতি, জন্ম, মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থান কিছুই করতে পারে না। আবার তাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তার শত্রু তার ওপর বিজয়ী হবে এবং তাকে বন্দী করে ফেলবে।

সুতরাং বান্দা আল্লাহর থেকে এক পলকের জন্যও অমুখাপেক্ষী নয় (সর্বদাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী); বরং বাহ্যিক ও গোপন সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণে তাঁর কাছে নিরুপায়, তাঁর কাছে পূর্ণ অভাবী ও মুখাপেক্ষী। এতদ্বসত্ত্বেও সে তাঁর থেকে পশ্চাদগামী, বিমুখ। সর্বাবস্থায় ও সর্বকাজে তাঁর কাছে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাঁর অবাধ্যতা করে তাঁর ক্রোধে পতিত হচ্ছে। সে তাঁর যিকির ভুলে গেছে, তাঁকে অবহেলা করছে; অথচ তাকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে এবং তাঁর সম্মুখেই হিসেবের জন্য দাঁড়াতে হবে!!

***

ফায়েদা: মানুষের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দেখাশুনা

তোমার অন্তরকে সব ধরনের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে তোমাকে যে কাজের আদেশ করা হয়েছে সে কাজে মনোনিবেশ করো। যে ব্যাপারে তোমাকে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে (রিযিকের ব্যাপারে) সে ব্যাপারে চিন্তা করো না; কেননা রিযিক ও হায়াত দু’টি পরস্পর একত্রে অবস্থানকারী। তোমার হায়াত যতক্ষণ বাকি থাকবে ততক্ষণ তোমার রিযিক আসতেই থাকবে। আল্লাহর হিকমতের কারণে রিযিকের কোনো পথ বন্ধ হলে তিনি তাঁর রহমতে তোমার জন্য এরচেয়েও উপকারী উত্তম পথ খুলে দিবেন।

একটি ভ্রূণের কথা চিন্তা করুন, সে মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় মায়ের নাভীর সাহায্যে একটিমাত্র পথে খাদ্য (রক্ত) আসত। যখন সে মাতৃগর্ভ থেকে ভুমিষ্ট হলো তখন তার খাদ্যের সে পথটি বন্ধ হয়ে গেলে আল্লাহ তার জন্য খাদ্যের দু’টি রাস্তা খুলে দিলেন। তার জন্য তৃপ্তিদায়ক খাঁটি দুধ প্রবাহিত করলেন যা পূর্বের চেয়ে আরো অধিক উত্তম ও সুস্বাদু। আবার যখন তার দুগ্ধপানের সময় শেষ হয়ে যায়, দুধ পান ছাড়ানোর মাধ্যমে সে পথ দু’টি বন্ধ হয়ে যায় তখন আল্লাহ তার জন্য পূর্বের চেয়ে উত্তম চারটি পথ খুলে দেন। দু’টি খাদ্য ও দু’টি পানীয়। পশু-পাখি ও উদ্ভিদ থেকে দু’টি খাদ্যের এবং পানি ও দুধ থেকে দু’টি পানীয়, তাছাড়া এ দু’প্রকারের অনুরূপ আরও কিছু উপকারী ও সুস্বাদু বস্তু তার জন্য তিনি খুলে দেন। সে যখন মারা যায় তখন তার এ চারটি পথ বন্ধ হয়ে যায়;

কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা তার জন্য –জান্নাতী হলে- আটটি পথ খুলে দেন, সেগুলো হলো জান্নাতের আটটি দরজা, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

রাব্বুল ‘আলামীন এমনই। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাকে দুনিয়াতে উত্তম ও অধিক উপকারী জিনিস প্রদান না করে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করেন না। এটি অমুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি তাদেরকে সর্বনিম্ন নিকৃষ্ট অংশ থেকেও বঞ্চিত করেন, আর সে তাঁর ওপর তাতে সন্তুষ্টও থাকে না; সে চায় যেন তাকে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান জিনিস প্রদান করা হোক। বান্দা নিজের ভালো-মন্দ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তাঁর রবের দানশীলতা, হিকমত ও দয়া সম্পর্কে না জানার কারণে তাকে যেসব জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং যা তার জন্য গচ্ছিত রাখা হয়েছে সেগুলোর পার্থক্য বুঝতে পারে না।

***

ফায়েদা: কীভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের স্বার্থ বাস্তবায়িত হবে?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত হাদীসে দুনিয়া ও আখিরাতের স্বার্থ একত্রিত করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ».

"তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো।"[8] দুনিয়া ও আখিরাতের নি'আমত ও স্বাদ কেবল আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে প্রাপ্ত হবে। আর শরীর ও মনের আরাম, দুনিয়া অন্বেষণে বেশি গুরুত্ব দেওয়া বা এর প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া, কষ্ট-ক্লেশ, একগুঁয়েমি, পরিশ্রম, দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণের মাধ্যমে অর্জিত হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করবে সে আখিরাতের সুখ ও নি'আমত লাভে সফলকাম হবে।

আর যে ব্যক্তি উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করবে সে দুনিয়ার ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা থেকে আরামে থাকবে। আল্লাহই সাহায্যকারী।

কবির ভাষায়:

দুনিয়া ডেকে বলছে, সৃষ্টিকুলের কেউ যদি তার কথা শুনতো।

বহু দৃঢ়প্রত্যয়ী জীবনযাপনকারীকে আমি ধ্বংস করেছি, আর বহু জমাকারী আমি তা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করেছি।

***

---

[8] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২১৪৪, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ফায়েদা: গুনাহের কাজ ও ঋণগ্রস্ততার কর্ম একত্রিকরণ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহের কাজ ও ঋণগ্রস্ততার কর্ম থেকে আশ্রয় চাওয়া একই হাদীসে একত্রিত করেছেন।[9] কেননা গুনাহ আখিরাতের ক্ষতিগ্রস্ততা অত্যাবশ্যকীয় করে আর ঋণগ্রস্ততা দুনিয়ার ক্ষতিগ্রস্ততা নিশ্চিত করে।

***

ফায়েদা: হিদায়াতের দিক থেকে পরিপূর্ণ মানুষ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩]

[9] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সালাতের পরে দো'আ করতেন এবং বলতেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ " فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرَمِ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»

"হে আল্লাহ, আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি গুনাহের কাজ ও ঋণগ্রস্ততার কর্ম থেকে। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, আপনি কতই না ঋণগ্রস্ততার কর্ম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি বললেন, যখন কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।" সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮৯।

“আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমরা অবশ্যই আমাদের পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৬৯] এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা হিদায়াতকে জিহাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। সুতরাং হিদায়াতের দিক দিয়ে সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ যে জিহাদের দিক থেকে সর্বাগ্রে। নফস, প্রবৃত্তি, শয়তান ও দুনিয়াদারীর বিরুদ্ধে জিহাদ হলো সর্বোত্তম ফরয জিহাদ। যে ব্যক্তি এ চারটির বিরুদ্ধে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জিহাদ করবে, আল্লাহ তাকে তাঁর সন্তুষ্টির পথ দেখাবেন যে পথ তাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। আর যে ব্যক্তি এগুলোতে জিহাদ পরিত্যাগ করবে সে জিহাদের প্রকারগুলোর মধ্যে যতটুকুতে জিহাদ বন্ধ করেছে ততটুকু হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হবে।

জুনায়েদ রহ. বলেছেন, যারা আমাদের পথে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তাওবার মাধ্যমে জিহাদ করবে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে ইখলাসের পথে পরিচালিত করব। আর এসব শত্রুর বিরুদ্ধে কখনও বাহ্যিকভাবে জিহাদ করা সম্ভব হবে না যতক্ষণ এসব শত্রুর বিরুদ্ধে গোপন জিহাদ করা না হবে। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে সে শত্রুর ওপরও বিজয় লাভ করবে। আর যে ব্যক্তির ওপর প্রবৃত্তি জয়লাভ করবে তার ওপর শত্রুও জয় লাভ করবে।

***

পরিচ্ছেদ: উচ্চাভিলাষ/উচ্চাকাঙ্খা/উচ্চ হিম্মত

ব্যক্তির ইচ্ছার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হিম্মত হলো, তার হিম্মত সম্পৃক্ত হবে আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর দীনি আদেশের উদ্দেশ্যের সাথে। অর্থাৎ তার কাজটি আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর দীনি আদেশ অনুযায়ী ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী করতে পারা, এটা সর্বোচ্চ হিম্মত বলে বিবেচিত হবে।

আর সর্বনিম্ন হিম্মত হলো, আল্লাহর থেকে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হিম্মত করা। সে আল্লাহর থেকে কিছু পাওয়ার জন্য তাঁর ইবাদত করে, আল্লাহ তার থেকে যা চায় সেজন্য তাঁর ইবাদত করে না। প্রথম প্রকারের হিম্মত আল্লাহর পক্ষ থেকে (বান্দার জন্য আসে) এবং আল্লাহও তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ইচ্ছা করেন। আর দ্বিতীয় প্রকারের হিম্মতে সে আল্লাহর থেকে কিছু পাওয়ার জন্য সংকল্প করে, এবং তা আল্লাহর (শরী‘আতগত) ইচ্ছা থেকে মুক্ত থাকে।

***

ফায়েদা: উলামায়ে সূ তথা আমলহীন আলিমদের বৈশিষ্ট্য

আমলহীন আলিমগণ জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের কথার মাধ্যমে মানুষদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকে আর তাদের কাজের মাধ্যমে লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকে। তারা যখনই কথার মাধ্যমে লোকদেরকে ডেকে বলে, এদিকে আসো, তখনই তাদের কাজ বলে, তাদের কথা শুনিও না। তারা যেসব কথা বলে তা যদি সত্যিকার অর্থেই বলত, তাহলে তারাই সর্বপ্রথম সে কাজ পালনে অগ্রগামী হতো। বস্তুত তারা বাহ্যিকভাবে পথপদর্শক হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা পথের মধ্যকার ডাকা।

***

পরিচ্ছেদ: পাপের মূলসমূহ

ছোট বড় সব ধরণের পাপের মূল হলো তিনটি। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে অন্তরকে সম্পৃক্ত করা, রাগশক্তির আনুগত্য ও প্রবৃত্তিশক্তির কথা অনুযায়ী চলা। এ তিনটি কাজ ক্রমানুসারে শির্ক, যুলুম ও অশ্লীলতা। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ও তাঁর সাথে অন্য কাউকে ডাকার পরিণতি শির্ক। রাগের মাথায় কোনো কাজ করার সর্বোচ্চ অন্যায় হচ্ছে হত্যা করা। আর অশ্লীলশক্তির আনুগত্য করে কাজ করলে এর পরিণতি যিনায় লিপ্ত হওয়া। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এ তিনটি কাজকে একত্রে এভাবে বলেছেন,

﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَ ٦٨﴾ [الفرقان: ٦٨]

“আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যে নাফসকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৮]

এ তিনটি অন্যায় কাজ একটির দিকে অন্যটি আহ্বান করে। শির্ক যুলুম ও অশ্লীলতার দিকে ডাকে যেমনিভাবে ইখলাস ও তাওহীদ ব্যক্তিকে যুলুম ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿كَذَٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُخۡلَصِينَ٢٤﴾ [يوسف: ٢٤]

"এভাবেই, যাতে আমরা তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দিই। নিশ্চয় সে আমার খালেস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৪]

***

ফায়েদা: কুরআন ত্যাগ করার ধরণসমূহ

কুরআন ত্যাগ করার অনেক ধরণ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

প্রথমত: কুরআন শ্রবণ না করা, এর প্রতি ঈমান না আনা এবং কুরআনের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া।

দ্বিতীয়ত: কুরআন অনুযায়ী আমল ত্যাগ করা, কুরআনের হালাল ও হারামের কাছে অবস্থান না করা; যদিও সে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং এর প্রতি ঈমান আনে।

তৃতীয়ত: কুরআন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা না করা ও কুরআনের ফয়সালা না মানা।

চতুর্থত: কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বুঝে পড়া পরিত্যাগ করা এবং কুরআন থেকে আল্লাহর উদ্দেশ্য বুঝা বাদ দেওয়া।

পঞ্চমত: অন্তরের সব রোগ-ব্যাধির নিরাময়ে কুরআনকে ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করা পরিত্যাগ করা। যার ফলে সে কুরআন ছেড়ে অন্য কিছু দ্বারা

আরোগ্য লাভে চেষ্টা করে এবং কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করানো না মানা। উপরোক্ত সব প্রকার নিম্নোক্ত আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَٰرَبِّ إِنَّ قَوۡمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا ٣٠﴾ [الفرقان: ٣٠]

"আর রাসূল বলবে, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে।" [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৩০] যদিও কতিপয় পরিত্যাগ একটির তুলনায় অন্যটি বেশি জঘন্য।

এ সব লোকদের অন্তরে কুরআনের দ্বারা সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়। আর তারা নিজেরা তা বুঝতে পারে এবং এ জটিলতা তারা অন্তরে অনুভব করে। দীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টিকারী এমন কাউকে পাবে না, উক্ত বিদ'আত করার সময় যার অন্তরে কিছু আয়াতের ব্যাপারে সংকীর্ণতা আসে না, বিশেষ করে যে সব আয়াত তাদের ও তাদের কাজের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, এ বিষয়টি নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা-গবেষণা করো। অতঃপর নিজের জন্য যেটা পছন্দ করো সেটি গ্রহণ করো।

***

ফায়েদা: তোমার অন্তরকে আখিরাতের জন্য খালি করো

যখন কোনো বান্দা সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয় (তার অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো চিন্তা না থাকে) তখন আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত প্রয়োজনের দায়িত্বভার নিয়ে নেন, সে যেসব ব্যাপারে চিন্তা করে তা তার থেকে দূরীভূত করে দেন, তার অন্তরকে তিনি শুধু তাঁর

ভালোবাসার জন্য, জবানকে তাঁর যিকিরের জন্য এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাঁর আনুগত্যের জন্য খালি করে দেন। আর যদি সে এমন অবস্থায় সকাল ও সন্ধ্যা করে যে, দুনিয়াই তার সকল চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু, তখন আল্লাহ তার ওপর দুনিয়ার দুশ্চিন্তা, দুঃখ-বেদনা ও কষ্ট-ক্লেশ চাপিয়ে দেন এবং তিনি তাকে নিজের ওপর ন্যস্ত করে দেন। ফলে তার অন্তর আল্লাহর ভালোবাসা ছিন্ন হয়ে সৃষ্টির ভালোবাসায় ব্যস্ত হয়ে যায়, তার জবান আল্লাহর যিকির বাদ দিয়ে সৃষ্টিকুলের যিকির করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর আনুগত্য না করে সৃষ্টির খিদমত ও কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيِّضۡ لَهُۥ شَيۡطَٰنٗا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٞ ٣٦﴾ [الزخرف: ٣٦]

"আর যে রহমানের (পরম করুণাময় আল্লাহর) যিকির থেকে বিমুখ থাকে আমরা তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩৬]

***

কায়েদা: ঈমানের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দিক

ঈমানের রয়েছে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়। এর প্রকাশ্য দিক হলো জবানের দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করা এবং অপ্রকাশ্য দিক হচ্ছে, অন্তরে ঈমানের সত্যায়ন করা, ঈমানের চাহিদানুযায়ী আত্মসমর্পণ করা ও ঈমানকে ভালোবাসা। অতএব, বাহ্যিক ঈমান কোনো উপকারে আসবে না যদি ঈমাননের অপ্রকাশ্য দিকগুলো

ঠিক না হয়; যদিও এ ঈমান তাকে রক্তপাত থেকে বিরত রাখবে, তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা দিবে। অন্যদিকে অপ্রকাশ্য ঈমানও যথেষ্ট হবে না যতক্ষণ বাহ্যিক ঈমান ঠিক না হবে; তবে হ্যাঁ, ব্যক্তি যদি কোনো কারণে অক্ষম হয় বা বাধ্য হয় বা জীবন নাশের আশঙ্কা থাকে। সুতরাং প্রকাশ্য আমল গোপনীয় আমলের বিপরীত হলে এবং এর সাথে প্রকাশ্য আমল করা থেকে বিরত রাখার দলীল না থাকে তাহলে তার অপ্রকাশ্য আমল নষ্ট বলে বিবেচিত হবে ও তাকে ঈমানহীন বলা হবে। প্রকাশ্য আমলের ত্রুটি অপ্রকাশ্য ঈমানের ত্রুটির প্রমাণ। এমনিভাবে প্রকাশ্য আমলের জোরদারী অপ্রকাশ্য আমলের জোরদারীর প্রমাণ।

অতএব, ঈমান হলো ইসলামের মূলবিন্দু ও সারাংশ। আর ইয়াকীন হলো ঈমানের হৃৎপিণ্ড ও শ্রেষ্ঠাংশ। যে ইলম ও আমল ঈমান ও ইয়াকীনকে বৃদ্ধি করে না তা প্রকৃত ইলম ও আমল নয়; আবার যে ঈমান আমলের প্রতি উৎসাহিত করে না তাও প্রকৃত ঈমান নয়।

ফায়েদা: তাওয়াক্কুলের প্রকারভেদ এবং এর হাকীকত

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল কয়েক প্রকার।

প্রথমত: বান্দার প্রয়োজন মিটানো ও দুনিয়ার অংশ পাওয়ার জন্য আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা অথবা অপছন্দনীয় জিনিস ও দুনিয়াবী বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ যেসব জিনিস পছন্দ করেন, যেমন ঈমান, ইয়াকীন, জিহাদ ও আল্লাহর পথে দাওয়াত ইত্যাদি অর্জনে তাওয়াক্কুল করা।

এ দু’প্রকারের তাওয়াক্কুলের মধ্যকার পার্থক্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ গননা করতে পারবে না। কেননা বান্দা যখন যথাযথভাবে দ্বিতীয় প্রকারের তাওয়াক্কুল করবে তখন তার প্রথম প্রকারের সব প্রয়োজন পুরোপুরিভাবে মিটে যাবে। আর যদি বান্দা প্রথম প্রকারের তাওয়াক্কুল করবে তখন তার জন্য যদিও দ্বিতীয় প্রকারের তাওয়াক্কুল যথেষ্ট হবে; তবে আল্লাহ যেসব কাজ পছন্দ করেন ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন ইত্যাদি কাজে তাওয়াক্কুলকারীর যে মর্যাদা রয়েছে সে মর্যাদা প্রাপ্ত হবে না।

আল্লাহর ওপর সর্বোচ্চ তাওয়াক্কুল হলো হিদায়াত প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা, তাওহীদকে শির্ক ও বিদ‘আত মুক্ত করা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা ও বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ইত্যাদির জন্য একমাত্র আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা। এগুলো রাসূলগণ ও তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণের তাওয়াক্কুল।

তাওয়াক্কুলের অন্তর্নিহিত রহস্য ও হাকীকত হলো, একমাত্র আল্লাহর ওপর অন্তরে আস্থা রাখা এবং এ তাওয়াক্কুলের সাথে দুনিয়াবী কোনো উপায়-উপকরণের সাহায্য নেওয়া থেকে বিরত থাকা ও অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল না হওয়া। যেমন, ব্যক্তির এ কথা কোনো উপকারে আসবে না যদি সে এভাবে বলে, ‘আমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করলাম, সাথে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হলাম, তার ওপর আস্থা রাখলাম ও তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম। সুতরাং জবানের তাওয়াক্কুল আর অন্তরের তাওয়াক্কুল দু’টি দুই জিনিস। যেমন, অন্তরে বারবার গুনাহ

করার ইচ্ছা পোষণ করে জবানের তাওবা এবং অন্তরের তাওবা- যদিও জবানে উচ্চারণ না করে দু’টি দুই জিনিস। যেমন বান্দার কথা, আমি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করলাম সাথে অন্যের ওপর অন্তরে আস্থা রাখলাম, একথা যেমন কোনো কাজে আসবে না, তেমনিভাবে বান্দার কথা আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করলাম আর সে অন্তরে বারবার গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তার এ তাওবা কোনো কাজে আসবে না।

ফায়েদা: চরম মূর্খতা

চরম মূর্খ সে ব্যক্তি যে মানুষের কাছে আল্লাহর ব্যাপারে নালিশ করে। এ মূর্খতা হলো চরম মূর্খতা। কেননা সে জানে না কার কাছে নালিশ করতে হবে এবং কার বিরুদ্ধে নালিশ করতে হবে। সে যদি তার রবকে যথাযথভাবে জানত তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে সে কোনো অভিযোগ করত না। অন্যদিকে সে যদি মানুষকে সঠিকভাবে চিনত তাহলে তার কাছেও আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করত না।

একজন সৎপূর্বসূরী থেকে বর্ণিত আছে, ‘একব্যক্তি আরেকব্যক্তির কাছে তার অভাব-অভিযোগের কথা বলল। তার কথা শুনে লোকটি বলল, হে ভাই, আল্লাহর কসম, যে তোমাকে কোনো রহমত করে না তার কাছে যিনি তোমার ওপর রহমত করেন তাঁর ব্যাপারে অভিযোগ করছ। তখন তাকে বলা হলো,

তুমি যখন বনী আদমের কাছে তোমার অভাবের অভিযোগ করছ, তখন তুমি মূলত যে তোমাকে কোনো দয়া করে না তার কাছে যিনি তোমাকে দয়া করেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছ।’

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ ٣٠﴾ [الشورى: ٣٠]

“আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৩০]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٖ فَمِن نَّفۡسِكَ ٧٩﴾ [النساء : ٧٩]

“আর যে অকল্যাণ তোমার কাছে পৌঁছে তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৭৯]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ قَدۡ أَصَبۡتُم مِّثۡلَيۡهَا قُلۡتُمۡ أَنَّىٰ هَٰذَاۖ قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أَنفُسِكُمۡۗ ١٦٥﴾ [ال عمران: ١٦٥]

“আর যখন তোমাদের ওপর বিপদ এল, (অথচ) তোমরা তো এর দ্বিগুণ বিপদে আক্রান্ত হলে (বদর যুদ্ধে)। তোমরা বলেছিলে এটা কোত্থেকে? বল, ‘তা তোমাদের নিজদের থেকে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৫]

অতএব, এখানে অভিযোগের তিনটি স্তর রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

সবচেয়ে নিকৃষ্ট অভিযোগ হচ্ছে, সৃষ্টির কাছে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া।

সর্বোচ্চ স্তরের হলো, আল্লাহর কাছে নিজের অভিযোগ দেওয়া।

মধ্যম স্তরের অভিযোগ হলো, তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া।

কায়েদা: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ٢٤﴾ [الانفال: ٢٤]

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন সে তোমাদেরকে আহ্বান করে তার প্রতি, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।” [সূরা আল- আনফাল, আয়াত: ২৪]

উপরোক্ত আয়াত কয়েকটি বিষয় সন্নিবেশিত করেছে। সেগুলো হলো: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমেই কল্যাণকর জীবন অর্জিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এ আহ্বানে সাড়া দিবে না তার জীবনই নাই; যদিও তার জীব-জানোয়ারের

মতো জীবন বিদ্যমান যা তার ও নিকৃষ্ট প্রাণির মাঝে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র জীবন সেটি-ই যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় সাড়া দেয়। তারাই জীবিত, যদিও তারা মারা যায়। আর অন্যরা মৃত, যদিও তারা সারা জীবন বেঁচে থাকে।

এ কারণেই জীবনের দিক দিয়ে পূর্ণ মানুষ সে ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে পরিপূর্ণভাবে সাড়াদানকারী। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে ডাকেন তা-ই হলো জীবন। সুতরাং উক্ত আহ্বানের যার কিছু অংশ ছুটে যাবে তার জীবনেরও কিছু অংশ ছুটে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকের সাড়া দেওয়া অনুসারে সে জীবনের অংশ লাভ করবে।

ফায়েদা: সর্বাধিক উপকারী বস্তু: নফসের বিরুদ্ধাচরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦﴾ [البقرة: ٢١٦]

“তোমাদের ওপর লড়াইয়ের বিধান দেওয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর

আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১৬]

﴿فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩﴾ [النساء: ١٩]

“আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯]

প্রথম আয়াতটি জিহাদ সম্পর্কে। এতে রয়েছে মানুষের চরম ক্রোধশক্তি। আর দ্বিতীয় আয়াতটি বিবাহ সম্পর্কে। এতে রয়েছে মানুষের পরিপূর্ণ প্রবৃত্তিশক্তি।

বান্দা তার পূর্ণাঙ্গ ক্রোধশক্তি সহকারে জীবনের ভয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে অপছন্দ করে, অথচ তার এ অপছন্দ তার দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর। সে জিহাদ না করে নিজের জীবন বাচাঁতে চায় ও জিহাদ পরিত্যাগ করতে চায়, অথচ তার এ প্রিয়তা তার দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য অকল্যাণকর।

এমনিভাবে নারীর কোনো দোষের কারণে ব্যক্তি তাকে অপছন্দ করে; অথচ তাকে তালাক না দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখলে এতে তার জন্য এমন সব কল্যাণ রয়েছে যা সে জানে না। আবার নারীর কোনো গুণের কারণে তাকে ভালোবাসে; অথচ তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দেওয়াতে এমন সব অকল্যাণ রয়েছে যা সে অবগত নয়।

অতএব, মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর বর্ণনা অনুযায়ী মানুষ অধিক যালিম ও জাহেল (অত্যন্ত যুলুমকারী ও অজ্ঞ)। তাই তার ভালো-মন্দ, উপকার-ক্ষতির মাফকাঠি তার মনের টান, ভালোবাসা, অপছন্দ ও ঘৃণা ইত্যাদি হতে পারে না; রবং তার মহান আল্লাহ তার জন্য যা পছন্দ করেছেন সেসব আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকাই তার ভালো-মন্দের মাফকাঠি।

সুতরাং সার্বিকভাবে মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারী জিনিস হলো প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় তার রবের আনুগত্য করা। আর তার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যে তার রবের নাফরমানী করা। বান্দা যখন একনিষ্ঠার সাথে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করবে তখন তার অপছন্দনীয় জিনিসগুলোও তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর যখন সে আনুগত্য ও ইবাদতশূন্য হবে তখন তার প্রিয় জিনিসগুলোও তার জন্য অকল্যাণকর হবে। যে ব্যক্তির তার রবের জ্ঞান, তার নামসমূহ ও সিফাতসমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জিত হবে তখন সে দৃঢ়ভাবে জানবে যে, যেকোনো অকল্যাণই তাকে স্পর্শ করুক এবং যেসব পরীক্ষায় সে পতিত হোক তা সবকিছুই তার কল্যাণ ও উপকারের জন্যই, এ সম্পর্কে তার জ্ঞান ও জানা নেই; বরং বান্দা যা কিছু ভালোবাসে তার চেয়ে সে যা কিছু অপছন্দ করে তাতেই তার অধিক কল্যাণ নিহিত।

অতএব, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ যা কিছু অপছন্দ করে তাতেই তার কল্যাণ নিহিত। এমনিভাবে অধিকাংশ অকল্যাণ ও ধ্বংসের উপকরণ তার পছন্দনীয় জিনিসের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে।

তাই আহকামুল হাকেমীন তথা সমস্ত বিজ্ঞের বিজ্ঞ, আরহামুর রাহেমীন তথা সমস্ত দয়াময়ের মহাদয়াময় ও সৃষ্টিকুল সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই বান্দার প্রতি তার নিজের ও বাবা-মায়ের চেয়ে সর্বাধিক দয়াশীল। তিনি বান্দার ওপর কোনো বিপদ-আপদ নাযিল করলে তা তার ওপর নাযিল না করার চেয়ে অধিক কল্যাণকর। যেহেতু তিনি তার ওপর অধিক দেখ-ভাল, দয়া ও মমতা করেন। তিনি যদি তাদের ভালো-মন্দ তাদের পছন্দের ওপর ছেড়ে দিতেন তাহলে তারা তাদের জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও আমলের দিক থেকে কোনটি তাদের জন্য অধিকতর উপযোগী ও কল্যাণকর তা নির্ধারণে অক্ষম হতো। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা স্বীয় ইলম, হিকমত ও রহমতে তাদের পরিচালনার দায়িত্বভার তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। এতে তারা তা পছন্দ করুক আর না-ই পছন্দ করুক। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীগণ তাঁর সম্পর্কে, তাঁর নামসমূহ ও সিফাতসমূহ সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানেন। ফলে তারা তাঁর হিকমতের ব্যাপারে অপবাদ দেন না। অন্যদিকে মূর্খদের কাছে আল্লাহর সঠিক জ্ঞান, তাঁর নামসমূহ ও সিফাতসমূহ অজানা থাকায় তারা তাঁর পরিচালনার ব্যাপারে বাদানুবাদ ও ঝগড়া করেন এবং তাঁর হিকমতের ব্যাপারে অপবাদ দেন। তারা তাঁর হুকুমে আত্মসমর্পন করেন না, তাঁর হুকুমকে তাদের ভ্রান্ত জ্ঞান, বাতিল মতবাদ ও অন্যায় রাজনীতির সামনে বিরোধপূর্ণ মনে করেন।

ফলে তারা তাদের রবকে চিনতে পারে নি এবং তাদের কল্যাণও অর্জিত হয় নি। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

কায়েদা: সমস্ত কল্যাণের মূল

সমস্ত কল্যাণের মূল হলো এ কথা জানা যে, আল্লাহ যা কিছু ইচ্ছা করেন তা হবেই এবং তিনি যা কিছু চান না তা কখনওই হবে না। অতএব, এ ইয়াকীন রাখা যে, সৎকাজ আল্লাহর অন্যতম নি'আমত, তাই এর জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং আল্লাহর কাছে বিনীত মিনতি করা যে, তিনি যেন কখনও এ নি'আমত ছিন্ন না করেন। আর অসৎকাজ তাঁর অপমান ও শাস্তিস্বরূপ। সুতরাং আল্লাহর কাছে করজোরে আকুতি-মিনতি করা যে, তিনি যেন অসৎকাজ ও তার মধ্যে বাধা প্রদান করেন। সৎকাজ করা ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য নিজের ওপর নির্ভরশীল না হওয়া।

আল্লাহকে যারা যথাযথভাবে জেনেছে তারা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, সমস্ত কল্যাণের মূল হলো বান্দার প্রতি আল্লাহর তাওফীক, আর সব অন্যায় কাজের মূল হলো আল্লাহ বান্দাকে একাকী ছেড়ে দেওয়া। তারা আরও একমত যে, তাওফীক হলো আল্লাহ তোমাকে তোমার নিজের ওপর নির্ভরশীল করবেন না। আর আল্লাহ তোমাকে পরিত্যাগ করা হলো তোমাকে ও তোমার নফসকে একা ছেড়ে দেওয়া। যেহেতু সব কল্যাণের মূল হলো আল্লাহর তাওফীক (আর এ তাওফীক আল্লাহর হাতে, বান্দার হাতে নয়) সুতরাং এ তাওফীকের চাবিকাঠি হলো দো'আ, আল্লাহর কাছে অভাবী হওয়া, সত্যিকারার্থে তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া, তাঁর প্রতি

আসক্ত হওয়া এবং তাঁর প্রতি বিরাগভাজন হওয়া। আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে এ চাবি দান করেন তখন তিনি তার জন্য কল্যাণের দরজা খুলে দেন। আর বান্দা যখন এ চাবি হারিয়ে ফেলে তখন তার কল্যাণের দরজা দুলতে দুলতে অন্যের কাছে চলে যায়।

আমিরুল মুমিনীন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'আমি কখনও দো'আ কবুল হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা করি না; শুধু দো'আ করার আশা করি। কেননা আমি যখনই দো'আ করার ইচ্ছা করি তখন আমার অন্তর এ কথা জানে যে, দো'আ কবুল হওয়া দো'আর সাথেই থাকে।'

বান্দার নিয়াত, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য ও আগ্রহ অনুসারে আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য হয়। অতএব, বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য বান্দার অভিপ্রায়, দৃঢ়তা, আগ্রহ ও আশঙ্কা অনুযায়ী হয়ে থাকে। আবার বান্দার নিয়ানুসারে আল্লাহ তাদেরকে পরিত্যাগ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওতা'আলা (যিনি সর্ববিজ্ঞ ও সৃষ্টিকুলের সর্বজ্ঞ) উপযুক্ত জায়গাতেই তাওফীক দান করেন এবং উপযুক্ত কারণেই তাকে পরিত্যাগ করেন। তিনি সর্বজ্ঞাত ও বিজ্ঞ। কেউ তাঁর শুকরিয়া না করলে এবং তাঁর কাছে স্বীয় অভাব প্রকাশ ও দো'আয় অবহেলা করলে তাকে আল্লাহ নি'আমত দান করেন না। আর যে ব্যক্তি তাঁর শুকরিয়া আদায়, যথার্থ অভাব প্রকাশ ও দো'আ করবে সে আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাঁর সাহায্যে তাঁর নি'আমত লাভে জয়ী হবে।

আর কল্যাণ লাভের মূল শর্ত হচ্ছে ধৈর্যধারণ। কেননা ধৈর্যধারণ করা ঈমানের সেরূপ অংশ, মাথা যেমন শরীরের অংশ। যখন মাথা কর্তিত হয় তখন শরীরের অবশিষ্টতা থাকে না।

ফায়েদা: দুনিয়াকে প্রধান্য দেওয়ার অনিষ্টসমূহ

যেসব আলিম দুনিয়াকে প্রধান্য দেয় ও ভালোবাসে তাকে অবশ্যই তার ফাতওয়া ও বিচার কাজে এবং আল্লাহ প্রদত্ত সংবাদ ও তা গ্রহণে অত্যাকশ্যকীয়তার ব্যাপারে আল্লাহর সম্পর্কে অসত্য কথা বলতে হবে। কেননা রবের অনেক হুকুম মানুষের প্রবৃত্তির বিপরীত। বিশেষ করে যারা ক্ষমতাধর ও শাসক এবং খাম-খেয়ালীর অনুসরণ করে তারা হকের বিপরীত কাজ করা ব্যতীত স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সক্ষম হবে না।

আলেম ও শাসক যখন নেতৃত্বকে ভালোবাসে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তখন হকের বিপরীত কাজ করা ব্যতীত এদুটি অর্জন হবে না। বিশেষ করে যখন কোনো কাজে সত্য-মিথ্যার সংশয় থাকে তখন তার সংশয়ের সাথে প্রবৃত্তি একত্রিত হয় এবং খাম-খেয়ালী-পনা প্রধান্য লাভ করে। ফলে সত্য লুকায় এবং হককে বিলুপ্ত করে, যদিও সত্যটি প্রকাশ্য থাকে এবং এতে অস্পষ্টতা ও সংশয় থাকে না। তথাপি সে সত্যের বিপরীত করতে অগ্রগামী হয় এবং বলে তাওবার মাধ্যমে আমার বাচাঁর উপায় আছে। এ ধরণের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ﴾ [مريم: ٥٩]

“তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৯] আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আরও বলেছেন,

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٞ وَرِثُواْ ٱلۡكِتَٰبَ يَأۡخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا ٱلۡأَدۡنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغۡفَرُ لَنَا وَإِن يَأۡتِهِمۡ عَرَضٞ مِّثۡلُهُۥ يَأۡخُذُوهُۚ أَلَمۡ يُؤۡخَذۡ عَلَيۡهِم مِّيثَٰقُ ٱلۡكِتَٰبِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِۗ وَٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٦٩﴾ [الاعراف: ١٦٨]

“অতঃপর তাদের পরে স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এমন বংশধর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা এ নগণ্য (দুনিয়ার) সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, ‘শীঘ্রই আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে’। বস্তুত যদি তার অনুরূপ সামগ্রী (আবারও) তাদের নিকট আসে তবে তারা তা গ্রহণ করবে। তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া বলবে না? আর তারা এতে যা আছে, তা পাঠ করেছে এবং আখিরাতের আবাস তাদের জন্য উত্তম, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা কি বুঝ না?” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৬৮]

গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা: নফস সর্বোত্তম যা কিছু অর্জন করে

নফস যা কিছু অর্জন করে, অন্তর যা কিছু লাভ করে এবং বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে যা কিছু পায় তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো ইলম এবং ঈমান।

এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে ইলম ও ঈমানকে একত্রিত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَٱلۡإِيمَٰنَ لَقَدۡ لَبِثۡتُمۡ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡبَعۡثِ﴾ [الروم: ٥٦]

“আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, ‘তোমরা আল্লাহর বিধান মত পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৫৬] আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ﴾ [المجادلة: ١١]

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।” [সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ১১]

এরা হলেন সৃষ্টির মূল ও শ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী। কিন্তু আধিকাংশ মানুষ ইলম ও ঈমানের প্রকৃত নাম ও হাকীকত বুঝতে ভুল করে যে ইলম ও ঈমানের দ্বারা সৌভাগ্য ও উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়। এমনকি প্রত্যেক মানুষ ভাবে যে, তার কাছে যে ইলম ও ঈমান আছে তার দ্বারাই সৌভাগ্য অর্জিত হবে; কিন্তু আসল ব্যাপার এরূপ নয়। বরং অধিকাংশ মানুষেরই নাজাতদানকারী ঈমান নেই, মর্যাদা উচুঁকারী ইলম নেই; বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইলম ও ঈমান নিয়ে এসেছেন এবং যে ইলম ও ঈমানের দিকে আহ্বান করেছেন, তিনি নিজে যে ইলম ও ঈমানের ওপর অটল ছিলেন, তাঁর

পরে তাঁর সাহাবীরা যে ইলম ও ঈমানে ওপর ছিলেন এবং তাদের পরবর্তীরা তাদের পদ্ধতি ও পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তারা সে ইলম ও ঈমানের পথসমূহকে কলুষিত করে ফেলেছে।

পরিচ্ছেদ: দাবী ও বাস্তবতার আলোকে ঈমান

অধিকাংশ মানুষ বা প্রায় সবারই ঈমান হলো দাবীমাত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ١٠٣﴾ [يوسف: ١٠٢]

“আর তুমি আকাঙ্খা করলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবার নয়।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০২] অধিকাংশ মুমিনের রয়েছে সংক্ষিপ্ত ঈমান। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত জ্ঞান, ইলম, স্বীকৃতি, এগুলোকে ভালোবাসা, এর বিপরীতগুলো জানা ও সেগুলোকে অপছন্দ ও ঘৃণা করা ইত্যাদি বিস্তারিত পরিসরে ঈমান হলো উম্মতের বিশেষ বিশেষ লোক ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ সহচরের ঈমান। এটিই হলো সিদ্দিক ও তার মত লোকদের ঈমান।

অধিকাংশ মানুষের ঈমানের অংশ হলো সৃষ্টিকারীর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন।

আবার অন্যদের ঈমান বলতে শুধু শাহাদাতাইন (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাক্ষ্য) মুখে উচ্চারণ করা।

আবার আরেক দলের ঈমান হলো, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা মহান আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, শুধু এ বিশ্বাস করা, যদিও তার যবান একথা স্বীকৃতি দেয় না এবং সে তার ঈমানের চাহিদা অনুযায়ী কোনো আমলই করে না।

আরেকদলের কাছে ঈমান হলো, রবের সিফাতসমূহকে অস্বীকার করা।

অন্য দলের কাছে ঈমান হলো, তাদের স্বাদ, ইচ্ছা ও পছন্দ মতো আল্লাহর ইবাদত করা।

আরেকদলের কাছে ঈমান হলো, তারা তাদের বাপ-দাদাকে যে দীনের ওপর পেয়েছে সে দীনের ওপর ঈমান আনা; বরং তাদের ঈমান দু'টি জিনিসের ওপর ভিত্তি করে গঠিত:

প্রথমত: এ কথা আমাদের পূর্ববর্তীদের ও আমাদের বাপ-দাদাদের।

দ্বিতীয়ত: তারা যা বলেছে তা-ই সত্য।

আবার আরেক দলের কাছে ঈমান হলো, সচ্চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহার।

কিছু লোকের কাছে ঈমান বলতে বুঝায়, দুনিয়া ও এর সম্পর্কিত সব কিছু ত্যাগ করা।

উপরোক্ত সব দলই ঈমানের হাকীকত বুঝতে পারে নি, তারা ঈমানের ওপর স্থির নয় এবং অন্যদেরকেও স্থির করতে পারে নি। তারা কয়েক প্রকারের:

একদল ঈমানকে ঈমানেরই বিপরীত কাজ বানিয়েছে।

আরেকদল এমন সব কাজ ঈমানের অংশ বানিয়েছে যা ঈমান হিসেবে ধর্তব্য নয়।

আবার আরেকদল ঈমানের শর্তকে ঈমান বানিয়েছে অথচ এ শর্তগুলো পূরণই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়।

আরেকদল ঈমান সাব্যস্ত করতে এমনসব শর্তারোপ করেছেন যা ঈমানেরই পরিপন্থী ও বিপরীত।

আবার আরেকদল ঈমানের মধ্যে এমনসব শর্ত আরোপ করেছেন যা কোনোভাবেই ঈমানের শর্ত নয়।

সবকিছু বাদ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ঈমান হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত সমস্ত জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত এমন এক বাস্তবতা, যা চুক্তি হিসেবে এর প্রতি সত্যায়ন করা, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া, ভালোবাসা ও বিনয়ের সাথে আত্মসমর্পণ করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় এ অনুযায়ী আমল করা, জীবনে তা বাস্তবায়ন করা ও সাধ্যানুযায়ী এর দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া।

ঈমানের পূর্ণতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে অপছন্দ করা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে কিছু দান করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাউকে কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকা। আল্লাহকে একক ইলাহ ও মা‘বুদ হিসেবে মানা। ঈমানের পথ হলো প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বাবস্থায় তাঁর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

পথ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর দিকে না তাকিয়ে চক্ষু বন্ধ রাখা। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা: সৌভাগ্যের উপায়সমূহ

যেসব মৌলিক উসূলের ওপর ভিত্তি করে বান্দার সুখ-সৌভাগ্য অর্জিত হয় তার ভিত্তি তিনটি। এ তিনটির প্রত্যেকটির বিপরীত দিক রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি মূল অর্জন করবে সে বিপরীতটি থেকে মুক্ত থাকবে। যেমন, তাওহীদের বিপরীত শির্ক, সুন্নাহ এর বিপরীত বিদ'আত, আনুগত্যের বিপরীত অবাধ্যতা। এ তিনটি উসূলের বিপরীত একটিই। তাহলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পুরস্কার পাওয়ার আগ্রহ এবং আল্লাহর ভয় ও তাঁর শাস্তির ভয় থেকে অন্তরকে খালি করা অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করা, কোনো কিছু পাওয়া বা কোনো কিছুর ভয়ে তাঁর আদেশ-নিষেধ না মানা)।

গুরুত্বপূর্ণ কায়েদা: মুমিন ও পাপীর পথ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ وَلِتَسۡتَبِينَ سَبِيلُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ۝٥٥﴾ [الانعام: ٥٥]

"আর এভাবেই আমরা আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি। আর যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৫৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ ١١٥﴾ [النساء : ١١٥]

"আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৫]

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেন যেভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে অপরাধীদের পথও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এবং উভয়ের পরিণতি, কর্ম, তাদের বন্ধু-বান্ধব, মুমিনদের জন্য আল্লাহর তাওফীক আর পাপীদেরকে আল্লাহর পরিত্যাগ, মুমিনদের তাওফীকের উপায়সমূহ ও অপরাধীদেরকে আল্লাহর পরিত্যাগের কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ এ দু'টি বিষয় তাঁর কিতাব আল-কুরআনে সুস্পষ্ট করেছেন, খুলে বলেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন এবং এদুটি পথ স্পষ্ট করার কারণও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন যাতে আলো ও অন্ধকার দর্শনের ন্যায় চক্ষুবানরা তা দেখতে পায় ও বুঝতে পারে।

যে ব্যক্তি অপরাধীদের পথ চিনতে পারে না এবং সে পথ যদি তার কাছে স্পষ্ট না হয় তবে সে পাপীদের পথকে মুমিনদের পথ মনে করবে। বিশ্বাস, ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে যেমনটি এ উম্মতের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, যে গুলো পাপী, কাফির ও রাসূলদের শত্রুর পথ সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় তারা এ পথকে মুমিনদের পথের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে এবং তারা সেদিকে মানুষকে ডাকছে, যারা এ পথের বিরোধী তাদেরকে তারা কাফির বলছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু হারাম করেছেন সেগুলোকে তারা হালাল মনে করছে। যেমনটি করছে অধিকাংশ বিদ‘আতীরা বিশেষ করে জাহমিয়্যাহ, কাদরিয়্যাহ, খাওয়ারিজ, রাওয়াফিয ও তাদের অনুরূপ বিদ‘আতীগণ, যারা বিদ‘আত সৃষ্টি করে লোকদেরকে সে বিদ‘আতের দিকে আহ্বান কররছে এবং এর বিরোধীদেরকে কাফির বলছে।

পরিচ্ছেদ: সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অপচয়সমূহ

দশটি ধ্বংসাত্মক জিনিস রয়েছে যা মানুষের কোনো উপকারে আসে না। সেগুলো হচ্ছে: আমলহীন ইলম; ইখলাসহীন ও রাসূলের পদ্ধতি পরিপন্থী আমল; ব্যয় না করা সম্পদ, দুনিয়াতে সে সম্পদের দ্বারা ভোগ করে না, আবার আখিরাতের জন্যও সে প্রেরণ করে না; আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর অনুরাগ ও মমতাহীন অন্তর; ব্যক্তির কোনো উপকারে ও কাজে আসে না এমন শরীর; প্রিয় ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করতে পারে না ও তার আদেশ মান্য করতে অক্ষম ভালোবাসা; অযথা কাজে ব্যয় অথবা ভালো ও আল্লাহর নৈকট্য লাভে ব্যয় করতে অক্ষম সময়; অকাজে ব্যবহৃত চিন্তা-চেতনা; যে খেদমত তোমাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে না এবং তোমার দুনিয়াবী কল্যাণও সাধন করতে পারে না; যার ভাগ্য আল্লাহর হাতে তাকে ভয় করা বা তার কাছে কিছু চাওয়া, অথচ সে আল্লাহর অধীনে বন্দী, সে নিজেই নিজের কোনো উপকার, ক্ষতি, জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান করতে পারে না।

এ সব অপচয়ের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক অপচয় হলো অন্তর ও সময়ের অপচয়। দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রধান্য দেওয়া হলো

অন্তরের অপচয় এবং দীর্ঘদিন বাচাঁর আশা সময়ের অপচয়। ফলে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও দীর্ঘদিন বাচাঁর আশা সমস্ত বিনষ্টের মূল, আর কল্যাণ হলো আল্লাহর হিদায়াতের অনুসরণ ও তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া। আল্লাহই সাহায্যকারী।

পরিচ্ছেদ: আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি

বান্দার প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার কতিপয় আদেশ রয়েছে, যা করতে তিনি আদেশ দিয়েছেন, তাদের প্রতি তাঁর ফয়সালা রয়েছে যা তিনি তাদের ওপর ফয়সালা করেন, আবার তাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম নি‘আমত রয়েছে যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন। বান্দার প্রতি এ তিন ধরণের কাজ তিনি সরিয়ে নেন না।

আল্লাহর কাযা তথা ফয়সালা দু’প্রকার। বালা-মুসীবতে ও দোষ-ত্রুটিতে তাঁর ফয়সালা।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি স্তরে বান্দার ওপর আল্লাহর ইবাদত করা অত্যাবশ্যকীয়। অতএব, আল্লাহর কাছে প্রিয় বান্দা সে ব্যক্তি যে এ তিন স্তরে আল্লাহর উবুদিয়্যাত জানতে পেরেছে এবং সেগুলোর হক আদায় করেছে। সে বান্দাই আল্লাহর কাছে অধিক নিকটবর্তী এবং উক্ত তিন স্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর উবুদিয়্যাত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় ইলম ও আমল নষ্ট করে ফেলে সে ব্যক্তি আল্লাহর থেকে সর্বাধিক দূরে।

আল্লাহর আদেশের উবুদিয়্যাত হলো তাঁর আদেশসমূহ ইখলাসের সাথে পালন করা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি

অনুসরণ করা। আর আল্লাহর নিষেধের ক্ষেত্রে উবুদিয়্যাত হলো তাঁর ভয়, সম্মান ও ভালোবাসায় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা।

বালা-মুসিবতের ফয়সালায় তাঁর উবুদিয়্যাত হলো, এসব বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা, অতঃপর এতে সন্তুষ্ট থাকা, এটি ধৈর্যের উপরের স্তর, অতঃপর তাঁর শুকরিয়া আদায় করা, আর এটি সন্তুষ্টির উপরের স্তর।

দোষ-ত্রুটি ও অন্যায় কাজে পতিত হলে এমতাবস্থায় তাঁর উবুদিয়্যাত হলো, সাথে সাথে তাওবা করা, সে কাজটি পরিহার করা, তাঁর দুয়ারে ক্ষমা চাওয়া ও ভেঙ্গে পড়া। এ বিশ্বাস করা যে, তিনি ব্যতীত কেউ ক্ষমা করতে পারবে না, অন্যায় কাজ থেকে তিনি ব্যতীত কেউ রক্ষা করতে পারবে না, সে যদি এ অন্যায় কাজ করতে থাকে তাহলে সে তাঁর নৈকট্য থেকে দূরে সরে যাবে এবং তিনি তাকে তাঁর দরজা থেকে তাড়িয়ে দিবেন। ফলে সে নিজেকে নিরুপায় মনে করে যে, এ বিপদ থেকে তিনি ব্যতীত কেউ উদ্ধার করতে পারবে না; এমনকি সে এ সমস্যাকে শারীরিক সমস্যার চেয়েও বেশি মারাত্মক মনে করে।

নি‘আমত লাভের সময় উবুদিয়্যাত হলো, প্রথমত উক্ত নি‘আমতকে চেনা ও এর স্বীকৃতি দেওয়া, অতঃপর তিনি ব্যতীত অন্য কারো দিকে এ নি‘আমতের সম্পৃক্ততা ও মালিকানা তার অন্তরে যাতে না হয় সে জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া; যদিও কোনো কারণ বা উপকরণ কারো কাছ থেকে আসে, সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি নি‘আমতটির শুধু কারণ ও উসিলা মাত্র। কেননা সমস্ত নি‘আমত সর্বদিক বিবেচনায় একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। অত:পর, এ নি‘আমতের শুকরিয়া আদায়

করা এবং এ নি'আমতের কারণে তাঁকে ভালোবাসা। তাঁর শুকরিয়া হলো তাঁর আনুগত্য করা।

নি'আমত লাভের দ্বারা বান্দার ইবাদতের সূক্ষ্ম দিক হলো, অল্প নি'আমত লাভ করলেও সেটিকে বেশি মনে করা, আর অধিক শুকরিয়াকে অল্প শুকরিয়া মনে করা, দৃঢ়ভাবে জানা যে, এ নি'আমত তার মালিলেক পক্ষ থেকে, কোনো পারিশ্রমিক বা বিনিময়ে নয়, এটি প্রাপ্ত হওয়ার তার কোনো উসিলা ছিল না, সে এটি প্রাপ্যও ছিল না, এটি মূলতঃ আল্লাহরই, বান্দার জন্য নয়। নিজে তাঁর কাছে ভেঙ্গে পড়লে, বিনয়ী, নম্র ও নি'আমতদানকারীকে ভালোবাসলে তার নি'আমত আরও বৃদ্ধি পায়। যখনই নতুন নতুন নি'আমত লাভ করবে তখনই বেশি বেশি উবুদিয়্যাত, ভালোবাসা, বিনয় ও নম্রতা দেখাবে। আর যখন তিনি নি'আমত নিয়ে নিবেন তখন সন্তুষ্ট থাকবে। আবার যখনই গুনাহ করবে সাথে সাথে তাওবা করবে, হাতজোড় করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে। এ ধরণের বান্দাই হলো বুদ্ধিমান বান্দা। আর যে এ কাজ করতে অক্ষম হবে সে আল্লাহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

নসিহত: জান্নাতের পথ অতি সংক্ষিপ্ত ও খুব সহজ

আল্লাহর কাছে তাঁর পাশে দারুস সালামে যেতে এগিয়ে এসো, যেখানে যেতে অতবেশি কষ্ট-ক্লেশ, দুঃখ-বেদনা, পরিশ্রম করতে হবে না; বরং এটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ পথ। সেখানে যাওয়ার উপায় হলো, তুমি দু'টি সময়ের যে কোনো একটি সময়ে অবস্থান করছো। আর এটি মূলত তোমার হায়াত। তোমার হায়াত অতীত থেকে বর্তমান জীবন এবং

ভবিষ্যৎ জীবন। তোমার যে জীবন শেষ হয়ে গেছে সে জীবনের অন্যায়ের জন্য তাওবা, লজ্জিত হওয়া ও ইসতিগফার দ্বারা সংশোধন করা যাবে। আর এ কাজ করতে তোমাকে কষ্ট-ক্লেশ, দুঃখ-বেদনা সহ্য করতে হয় না এবং এটি কোনো কঠিন কাজও নয়; বরং এটি অন্তরের কাজ এবং ভবিষ্যতে এ গুনাহ থেকে বিরত থাকা। তোমার গুনাহর কাজটি থেকে বিরত থাকা তোমার জন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও সাচ্ছন্দ্যে থাকা। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ নয় যে কষ্টকর হবে, এ কাজটি শুধু দৃঢ় সংকল্প, চুড়ান্ত নিয়াত যা তোমার শরীর, মন ও গোপনীয় কাজকে আরাম দিবে। অতএব, যা কিছু ছুটে গেছে তা তাওবার দ্বারা সংশোধন করা এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সে কাজ করা থেকে বিরত থাকা, এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ও নিয়াত করা। এদুটি কাজ করতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো কষ্ট-ক্লেশ ও ব্যথা-বেদনা হয় না। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে তোমার হায়াত নিয়ে, যে সময় তোমার এদুটি সময়ের মধ্যকার। যদি তুমি এ সময়কে অপচয় করো, নষ্ট করো তাহলে তোমার সুখ-সৌভাগ্য, নাজাত সব কিছুই নষ্ট করে ফেলবে। আর যদি তুমি পূর্বের ও পরের সময়ের সংশোধনের সাথে তোমার চলমান জীবনকেও সংরক্ষণ করো তাহলে তুমি নাজাত পাবে, জান্নাতের আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস ও নি‘আমত লাভে সফলকাম হবে।

পূর্বের ও পরের অপরাধের সংশোধনের চেয়ে বর্তমান জীবনকে সংরক্ষণ করা অধিক কঠিন। কেননা এ জীবনকে গুনাহ থেকে রক্ষা করতে হলে যা কিছু তোমার জন্য উত্তম, উপকারী ও সৌভাগ্য অর্জনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সে কাজগুলো আঁকড়ে ধরা। এখানেই মানুষের মাঝে

অনেক পার্থক্য। আল্লাহর কসম, এটি তোমার বিগত জীবন যাতে আগত জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করতে হয়। সে পাথেয় অনুযায়ী তুমি হয়ত জান্নাতে যাবে নতুবা জাহান্নামে। পরকালের তুলনায় এ ক্ষুদ্র সময়ে যদি তুমি তোমার রবের পথে চলো তাহলে তুমি মহাসাফল্য ও মহাবিজয় অর্জন করবে। আর যদি প্রবৃত্তি, আরাম-আয়েশ, হাসি-তামাশায় জীবন কেটে দাও যা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে, তাহলে পরকালে তোমার পরিণতি সর্বদা যন্ত্রনাদায়ক আযাব, যা হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা, আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করা ও প্রবৃত্তি বিপরীত কাজ করার তুলনায় সে আযাবের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রনা ও বেদনা অত্যধিক কঠিন, শক্ত ও সর্বদা বিদ্যমান।

পরিচ্ছেদ: আল্লাহর সাথে থাকো

মানুষ যখন দুনিয়া নিয়ে মুখাপেক্ষীহীন হবে তখন তুমি আল্লাহকে নিয়ে মুখাপেক্ষীহীন হও, তারা যখন দুনিয়া পেয়ে খুশি হবে তখন তুমি আল্লাহ পেয়ে খুশি হও, তারা যখন তাদের প্রিয়জনদের সাথে একান্তে সময় কাটাবে তখন তুমি আল্লাহর সাথে একান্তে সময় কাটাও, তারা যখন তাদের রাজা-বাদশা ও নেতাদের কাছে পরিচিতি লাভ করবে যাতে তাদের দ্বারা ইজ্জত ও উচ্চপদ লাভ করা যায়, তখন তুমি আল্লাহর কাছে পরিচিতি লাভ করো, তাঁর কাছে অনুগ্রহ চাও তাহলে সর্বোচ্চ সম্মান ও উচ্চপদ লাভ করবে।

পরিচ্ছেদ: যুহুদ তথা দুনিয়া বিমুখতার প্রকারভেদ

দুনিয়া বিমুখতা কয়েক প্রকার। হারাম কাজে লিপ্ত না হওয়ার যুহুদ। আর এটি করা ফরযে আইন। দ্বিধা-সংশয়যুক্ত কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। দ্বিধা-সংশয়ের স্তরভেদে এর যুহুদেরও স্তর রয়েছে। দ্বিধা-সংশয় শক্তিশালী হলে তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব, আর দ্বিধা-সংশয় কম হলে তা থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব। আরেক প্রকার যুহুদ হলো অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। যেমন, অনর্থক কথাবার্তা, দৃষ্টি, প্রশ্ন, সাক্ষাৎ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। আরেক ধরণের যুহুদ হলো মানুষের কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা, নফসের ব্যাপারে যুহুদ, তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নফসের ওপর যে কোনো কাজকে সহজ মনে করা। সবচেয়ে উত্তম যুহুদ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে কোনো কিছু চাওয়া ও তোমার প্রয়োজন বলা থেকে বিরত থাকা।

সর্বোত্তম যুহুদ হলো যুহুদকে গোপন রাখা, আর সর্বাধিক কঠিন যুহুদ হলো ভাগ্যের ব্যাপারে যুহুদ।

যুহুদ ও ওরা‘আর মধ্যে পার্থক্য হলো, আখিরাতে যে সব কাজ উপকারে আসবে না সেসব কাজ ত্যাগ করাকে যুহুদ বলে, আর আখিরাতে যেসব কাজের ক্ষতির আশঙ্কা করা হয় সেসব কাজ ত্যাগ করাকে ওরা‘আ বলে। যেসব অন্তর শাহওয়াত তথা প্রবৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত তাতে যুহুদ ও ওরা‘আ সঠিকভাবে কাজ করে না।

পরিচ্ছেদ: আল্লাহর যিকির ও তাঁর শুকরিয়া

যিকির ও শুকর এ দু’টি মূল কায়েদার ওপর ভিত্তি করে দীন প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ١٥٢﴾ [البقرة: ١٥٢]

“অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার শোকর আদায় কর, আমার সাথে কুফরী করো না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেছেন,

«يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ» ، فَقَالَ: " أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».

“হে মু‘আয, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমিও আপনাকে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যা তুমি প্রত্যেক সালাতের পরে বলতে বাদ দেবে না। হে আল্লাহ আপনার যিকির, শুকরিয়া আদায় এবং আপনার ইবাদত উত্তমরূপে করতে আমাকে সাহায্য করুন।”[10] এখানে যিকির বলতে শুধু মুখের যিকিরকে বুঝানো হয় নি; বরং অন্তর ও মুখ উভয়ের যিকির

---

[10] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫২২; নাসায়ী, হাদীস নং ১৩০৩। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

উদ্দেশ্য। আল্লাহর যিকির বলতে তাঁর নামসমূহ, সিফাতসমূহ, তাঁর আদেশ, নিষেধ ও তাঁর বাণী ইত্যাদি স্মরণ করা সবই যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁর যিকির করতে হলে তাঁকে জানা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁর পরিপূর্ণ সিফাত, তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা, তাঁর সব ধরণের প্রশংসা জানা ও ঈমান আনা অত্যাবশ্যকীয় করে। আর এগুলো তাওহীদ ব্যতীত পরিপূর্ণ হয় না। অতএব, তাঁর প্রকৃত যিকির উপরোক্ত সব কাজ করা অত্যাবশ্যকীয় করে। এছাড়াও তাঁর নি'আমত, অনুগ্রহ ও সৃষ্টির প্রতি ইহসান ইত্যাদির স্মরণও তাঁর যিকির।

অন্যদিকে শুকর হলো, তাঁর আনুগত্য করা এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সব ধরণের পদ্ধতিতে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। এ বিষয় দু'টি দীনের ইজমা বিষয়। সুতরাং তাঁর যিকির তাঁকে চেনা অত্যাবশ্যকীয় করে, আর তাঁর শুকর তাঁর আনুগত্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ দু'টি উদ্দেশ্যেই আল্লাহ জিন, মানব, আসমান, জমিন সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এ দু'টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি সাওয়াব ও শাস্তির বিধান করেছেন, কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। এ বাস্তবতার জন্যই তিনি আসমান, জমিন ও দুয়ের মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এ দু'টির বিপরীত হলো বাতিল ও অনর্থক কাজ, যা থেকে আল্লাহ ঊর্ধ্বে ও পবিত্র।

পরিচ্ছেদ: হিদায়াত ও গোমরাহীর কারণ

আল-কুরআনে বারবার অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজসমূহকে হিদায়াত ও গোমরাহীর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এখানে অন্তর

ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজসমূহকে হিদায়াত পাওয়ার দাবীদার করা হয়েছে, মুসাব্বাব তথা সংঘটিত কাজটি সবব তথা কাজটির কারণ বানানো হয়েছে, এমনিভাবে প্রভাবসম্পন্ন কাজটিকে মুয়াসসির তথা কাজটির প্রভাবকারী বানানো হয়েছে। হিদায়াতের মতো গোমরাহীকেও একইভাবে বলা যায়। ভালো আমলসমূহ হিদায়াতের ফলাফল। ভালো কাজ যত বেশি হবে হিদায়াতও তত বেশি পাবে। এমনিভাবে পাপ কাজ যত বেশি হবে গোমরাহীও তত বেশি হবে। কেননা আল্লাহ ভালো কাজ পছন্দ করেন, তাই সৎকর্মশীলকে হিদায়াত এ সফলতা দান করে পুরস্কৃত করেন। তিনি পাপ কাজ অপছন্দ করে এবং পাপাচারীকে গোমরাহী ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে তাকে শাস্তি প্রদান করেন।

আল্লাহ উত্তম, তাই তিনি উত্তম ও সৎকর্মশীলকে ভালোবাসেন। তাদের সৎকর্ম অনুযায়ী তিনি তাদের অন্তরসমূহকে তাঁর নিকটবর্তী করেন। আবার তিনি যেহেতু অসৎ কাজ ঘৃণা করেন, ফলে অসৎ কাজের পরিমাণ অনুযায়ী তিনি তাদের অন্তরসমূহকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দেন। প্রথম প্রকারের মূল হলো আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী,

﴿ الٓمٓ ۝١ ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدًى لِّلۡمُتَّقِينَ ۝٢ ﴾ [البقرة: ١، ٢]

“আলিফ-লাম-মীম। এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১-২]

দ্বিতীয় মূলনীতি, পাপাচার, অহংকার, মিথ্যাচার ইত্যাদি গোমরাহীর কারণ, এ ব্যাপারেও আল-কুরআনে অনেক আয়াত এসেছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِۦ كَثِيرًاۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ ٢٦ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ٢٧﴾ [البقرة: ٢٦، ٢٧]

"তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন এবং এ দিয়ে অনেককে হিদায়াত দেন। আর এর মাধ্যমে কেবল ফাসিকদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন। যারা আল্লাহর দৃঢ়কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যা জোড়া লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং জমিনে ফাসাদ করে। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬-২৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُۢۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٨٨﴾ [البقرة: ٨٨]

"আর তারা বলল, আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত; বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। অতঃপর তারা খুব কমই ঈমান আনে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮৮]

পরিচ্ছেদ: সাবধান! মিথ্যা থেকে দূরে থেকো

মিথ্যা পরিহার করো। কেননা মিথ্যা তোমার বিদ্যমান জ্ঞানকে ধ্বংস করে দেয়। মিথ্যা তোমার জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি ও মানুষকে দেওয়া শিক্ষাকে

বিনষ্ট করে দেয়। কেননা মিথ্যাবাদী অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্বে বিদ্যমান মনে করে, আবার বিদ্যমান জিনিসকে অস্তিত্বহীন, সে হককে বাতিল, বাতিলকে হক, ভালোকে খারাপ, খারাপকে ভালো মনে করে। ফলে শাস্তিস্বরূপ তার ধারণা ও জ্ঞান তাকে বিনাশ করে।

এ কারণেই মিথ্যা সমস্ত পাপের মূল। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ»

“আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।”[11]

মিথ্যা প্রথম যখন অন্তর থেকে মুখে সংক্রমিত হয় তখন তা জবানকে নষ্ট করে দেয়, অতঃপর যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সংক্রমিত হয় তখন তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ ধ্বংস করে দেয় যেভাবে জবানের কথা ধ্বংস করে দেয়। তখন মিথ্যা তার কথাবার্তায়, কাজে-কর্মে, চলা-ফেরায় সর্বত্র বিরাজ করে এবং তার ওপর ধ্বংস আধিপত্য লাভ করে। তখন এ ব্যাধি তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ যদি সত্যের ঔষধ দ্বারা তাকে সুস্থ না করেন তাহলে এ ব্যাধি তার মূল সত্ত্বাকে গ্রাস করে নেয় যা তাকে ধ্বংস করে দেয়।

[11] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০৭।

এ জন্যই অন্তরের সব কাজের মূল হলো সত্যবাদীতা। সত্যবাদীতার বিপরীত হলো লৌকিকতা, আত্মভিমান, অহংকার, দম্ভ, ঔদ্ধত্য, অন্যায়, অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, লাঞ্ছনা ইত্যাদির মূল হলো মিথ্যাচার। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ভালো কাজের উৎস হলো সত্যবাদীতা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব খারাপ কাজের উৎস হলো মিথ্যাবাদীতা। আল্লাহ মিথ্যাবাদীকে কল্যাণ ও উপকারী কাজ থেকে সরিয়ে রেখে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। অন্যদিকে সত্যবাদীকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকর কাজের তাওফীক দান করে পুরস্কৃত করবেন। সত্যবাদীতার ন্যায় দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর গুণ নেই, আবার মিথ্যাবাদীতার মতো জঘন্য খারাপ ও ক্ষতিকর দোষও আর নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩ ﴾ [التوبة: ١١٩]

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৯] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿هَٰذَا يَوۡمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدۡقُهُمۡ ١١٩﴾ [المائدة: ١١٩]

"এটা হল সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সততা উপকার করবে।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১১৯] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿فَإِذَا عَزَمَ ٱلۡأَمۡرُ فَلَوۡ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ ٢١﴾ [محمد : ٢١]

“অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করত, তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২১] আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿وَجَآءَ ٱلۡمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ لِيُؤۡذَنَ لَهُمۡ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٩٠﴾ [التوبة: ٩٠]

“আর গ্রামবাসীদের থেকে ওযর পেশকারীরা আসল, যেন তাদের অনুমতি দেওয়া হয় এবং (জিহাদ না করে) বসে থাকল তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে অচিরেই যন্ত্রণাদায়ক আযাব আক্রান্ত করবে।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৯০]

পরিচ্ছেদ: সম্ভবত তোমরা কিছু বিষয় অপছন্দ করো; অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦﴾ [البقرة: ٢١٦]

“এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৬]

উপরোক্ত আয়াতে বান্দার জন্য অনেক হিকমত, রহস্য ও কল্যাণ আলোচনা করা হয়েছে। কেননা বান্দা যখন জানবে যে, কিছু অকল্যাণ কল্যাণের বেশে আসে, আবার কিছু কল্যাণ অকল্যাণের সাথে আসে, সে খুশির সময় অনিষ্ট থেকে যেমন নিরাপদ নয় তেমনি অকল্যাণের সময় কল্যাণকর কিছু আসতে পারে বলে সে নিরাশও নয়; কেননা সে শেষ পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ। আল্লাহ যা জানেন বান্দা তা জানে না। তিনি এ আয়াতে বান্দার জন্য কতিপয় বিষয় অত্যাবশ্যকীয় করেছেন। সেগুলো হচ্ছে:

আল্লাহর আদেশ মান্য করার চেয়ে উত্তম ও অধিক উপকারী কিছু নেই; যদিও শুরুতে তার জন্য কষ্টকর হয়। কেননা তাঁর আদেশ মানার শেষ পরিণতি কল্যাণকর, আনন্দময়, সুস্বাদু ও খুশি; যদিও তার নফস তা পালনে অপছন্দ করে, তবুও তা তার জন্য কল্যাণকর ও অধিক উপকারী। এমনিভাবে আল্লাহর নিষিদ্ধকাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর আর কিছু নেই, যদিও তার নফস তা কামনা করে এবং সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। কেননা এর শেষ পরিণতি দুঃখ-বেদনা, দুশ্চিন্তা, অকল্যাণ ও বালা-মুসিবত। মানুষের বিবেকের বৈশিষ্ট্য হলো যে, সে অধিক আনন্দ ও অধিক কল্যাণের আশায় সামান্য কষ্ট সহ্য করতে পারে এবং অধিক দুঃখ-কষ্ট ও দীর্ঘ মেয়াদী অকল্যাণ থেকে মুক্তি পেতে সামান্য ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ থেকে বিরত থাকতে পারে।

উপরোক্ত আয়াতের আরেকটি গুরু-রহস্য হলো, যিনি সব কিছুর শেষ পরিণতি জানেন তাঁর কাছে বান্দা নিজেকে আত্মসমর্পণ করা, তিনি তার

জন্য নির্ধারণ করেন ও ফয়সালা করেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা। যেহেতু সে এর দ্বারা উত্তম পরিণতি প্রত্যাশা করে।

আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, বান্দা তার রবের ওপর কোনো প্রস্তাবনা না দেওয়া, তাঁর নির্ধারিত বিষয় ছেড়ে অন্য কিছু নিজের জন্য পছন্দ না করা, তার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা না করা। কেননা হতে পারে তার পছন্দনীয় বিষয়ে ক্ষতি ধ্বংস বিদ্যমান ছিল যা সে অবগত ছিলো না। সুতরাং তার রবের পছন্দের উপরে অন্য কিছু পছন্দ করবে না; বরং সে তাঁর কাছে উত্তম কিছু পছন্দ করতে দো'আ করবে, তাঁর পছন্দে সন্তুষ্ট থাকবে, এর চেয়ে উত্তম কিছু হতে পারে না।

উপরোক্ত আয়াতের আরেকটি রহস্য হলো, বান্দা যখন নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয় এবং তাঁর পছন্দে রাজি-খুশি থাকে তখন তিনি তাকে তাঁর নির্ধারিত বিষয়ে শক্তি-সামর্থ, দৃঢ়প্রত্যয় ও ধৈর্য দান করেন এবং তিনি বান্দার ওপর আপতিত বিপদাপদ দূর করে দেন ও তাকে উত্তম পরিণতি দেখান, যা বান্দা নিজে পছন্দ করলে পেত না।

আয়াতের আরেকটি শিক্ষণীয় দিক হলো, আল্লাহ বান্দার জন্য সব কিছু পছন্দ করায় বান্দা কর্তৃক বিভিন্ন জিনিস পছন্দ করলে মানুষের চিন্তা-ভাবনার ক্লেশ থেকে তিনি তাকে স্বস্তি দান করেছেন এবং নানা সময় পরিবর্তনশীল বিভিন্ন পরিমাণ নির্ধারণ ও পরিচালনার কষ্ট থেকে তার অন্তরকে মুক্ত রেখে তাকে শান্তি প্রদান করেছেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর নির্ধারিত বিষয় না মানার কোনো উপায় নেই। তাই বান্দা যদি আল্লাহর

নির্ধারিত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং সে পরিমাণ তার কাছে আসে তাহলে তা প্রশংসনীয়, কৃতজ্ঞতাপ্রাপ্য ও তাঁর দয়াপ্রাপ্ত। নতুবা তার তাকদীর অনুযায়ী আল্লাহর নির্ধারিত বিষয় তার কাছে আসবেই (তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও) কিন্তু তখন তা তার জন্য নিন্দনীয় ও আল্লাহর দয়াপ্রাপ্ত হবে না। কেননা এটি তার পছন্দ অনুযায়ী ছিল না। আল্লাহর প্রতি বান্দার সোপর্দ ও সন্তুষ্টি যখন যথাযথভাবে হবে, তখন তিনি বান্দার জন্য নির্ধারিত বিষয়ে তাঁর অনুগ্রহ ও কোমলতা দিয়ে বেষ্টন করে রাখবেন। ফলে সে আল্লাহর দয়া ও কোমলতায় থাকবে। আল্লাহর দয়া তাকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং তাঁর কোমলতা নির্ধারিত বিষয় সহজ করে দিবে।

বান্দার ওপর যখন তার তাকদীর বাস্তবায়িত হয়ে যায়- আর ব্যক্তি তার তাকদীরকে ফিরানোর অপকৌশল সেটি বাস্তবায়ন হওয়ার অন্যতম কারণ- তখন মৃত প্রাণীদেহের ন্যায় সে তাকদীরের কাছে আত্মসমর্পণ করলে ও তাকদীরকে মেনে নিলে কোনো কাজে আসবে না; কেননা হিংস্র জন্তু মৃতপ্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে না।

পরিচ্ছেদ: প্রবৃত্তির অনিষ্টতা

প্রবৃত্তির চাহিদার ওপর ধৈর্যধারণের চেয়ে প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকার ওপর ধৈর্যধারণ করা অধিকতর সহজ। কেননা প্রবৃত্তি হয়ত কষ্ট ও শাস্তি অত্যাবশ্যকীয় করে অথবা প্রবৃত্তির চেয়ে অধিক আনন্দকে ছিন্ন করে অথবা এমন কিছু সময় নষ্ট করে যা শেষ হলে আফসোস ও অনুশোচনা ছাড়া কিছুই থাকবে না অথবা সম্মানহানী করবে, যা

অসম্মানী না করার চেয়ে উত্তম ছিলো অথবা কিছু সম্পদ নিয়ে যাবে, যা অবশিষ্ট থাকা শেষ হওয়া চেয়ে উত্তম অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করবে, যা বিদ্যমান থাকা বিনষ্ট হওয়ার চেয়ে উত্তম, কোনো নি‘আমত উঠিয়ে নেওয়া হবে, যা প্রবৃত্তির চাহিদা মিটানোর চেয়ে অবশিষ্ট থাকা অধিক মজাদার ও পবিত্রতম অথবা সামান্য কিছুর জন্য পথ করে দিবে যা ইতিপূর্বে সে পায় নি অথবা দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, উদ্বিগ্নতা, ভয়-ভীতি ইত্যাদি নিয়ে আসবে যা প্রবৃত্তির আরামের ধারে কাছেও নয় অথবা এমন কিছু ইলম ভুলিয়ে দিবে যা স্মরণ করা প্রবৃত্তিকে পাওয়ার চেয়ে অধিক মজাদার অথবা শত্রুকে নিরাশ করবে এবং বন্ধুকে চিন্তিত করবে অথবা ভবিষ্যৎ নি‘আমতের পথ বন্ধ হওয়া অথবা এমন কিছু দোষ-ত্রুটি আলোচনা করবে যেসব দোষ-ত্রুটি দূরীভূত হয় না। কেননা কর্ম গুণাবলী ও আখলাক পয়দা করে।

পরিচ্ছেদ: আখলাকের পরিধি

আখলাকের একটি সীমারেখা আছে যা অতিক্রম করলে তখন তা শত্রুতে পরিণত হয়, আবার যখন সে সীমায় কমতি করলে তা ত্রুটিপূর্ণ ও লাঞ্ছনাকর হয়।

ক্রোধের একটি সীমা রয়েছে। এটি হলো, প্রশংসিত বীরত্বতা ও নীচুতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে আত্মসম্মানবোধ। এটি রাগের পূর্ণ গুণ। কিন্তু যখন এটি তার সীমা অতিক্রম করে তখন ব্যক্তি সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারী হয়ে যায়। আবার এ সীমার চেয়ে কম হলে তখন তা ভীরুতা হয়, এটিকে তখন খারাপ জিনিস থেকে আত্মসম্মানবোধ বলা যায় না।

আগ্রহেরও একটি সীমা রয়েছে। আগ্রহের সীমা হলো, দুনিয়াবী বিষয়ে উপযোগিতা এবং দুনিয়ার পরিমিত অংশ প্রাপ্যের প্রচেষ্টা করা। কিন্তু যখন এ সীমায় ঘাটতি দেখা দেয় তখন তা অপমানকর ও অপচয় বলা হয়। আবার যখন এর সীমার চেয়ে বেশি আগ্রহ দেখা দিবে তখন তা অকল্যাণকর ও অপ্রশংসনীয় কাজে আগ্রহ প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ঈর্ষারও একটি পরিধি রয়েছে। তা হলো পূর্ণতা অর্জনে প্রতিযোগিতা করা এবং সমজাতীয় লোকদের মাঝে নিজে এগিয়ে থাকা আত্মসম্মানবোধ। কিন্তু এ সীমা অতিক্রান্ত করে ঈর্ষাকৃত ব্যক্তির থেকে নি'আমত চলে যাওয়া এবং তার কষ্ট হওয়ার আশা করলে তখন তা সীমালঙ্ঘন ও যুলুম হবে। আবার এ সীমার চেয়ে কম হবে তখন তা নীচুতা, দূর্বল হিম্মত ও ছোট মানসিকতা হিসেবে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

“দু’ধরনের লোক ছাড়া অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। একজন হলো এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। অপরজন হলো, যাকে আল্লাহ হিকমাত দান করেছেন, সে তার দ্বারা বিচার ফায়সালা করে এবং তা

অপরকে শিক্ষা দেয়।”[12] এ ধরণের ঈর্ষা প্রতিযোগিতামূলক, এতে ঈর্ষাকারী ঈর্ষাকৃত ব্যক্তির অনুরূপ হতে চায়, কাউকে অপমানিত করার ইচ্ছা পোষণ নয় যাতে ঈর্ষাকৃত ব্যক্তির থেকে নি‘আমত দূরীভূত হয়ে যাওয়ার আশা পোষণ করা হয়ে থাকে।

প্রবৃত্তিরও রয়েছে একটি সীমারেখা। তা হলো আনুগত্য ও ফযীলতপূর্ণ কাজ করতে করতে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হলে তা থেকে অন্তর ও বিবেককে বিশ্রাম ও আরাম দেওয়া এবং এ আরামের মাধ্যমে আরো ভালো কাজের প্রস্তুতি নেওয়া। অতএব, এ সীমা অতিক্রম করলে তখন তা অতিভোজন এবং অধিক সমকামী ও বিবাহ অন্বেষী হয়ে যাবে, যা ব্যক্তিকে পশুর পর্যায়ে নিয়ে যাবে। আবার উক্ত সীমার চেয়ে কম হলে এবং পূর্ণতা ও মর্যাদা অন্বেষী না হলে তা দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অপমানজনক হবে।

আরাম-আয়েশ ও বিশ্রামেরও একটি সীমা রয়েছে। আর তা হলো, আনুগত্য ও মর্যাদা লাভের জন্য অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা, ইন্দ্রিয় ও কার্যকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শক্তিশালী করা এবং এর জন্য সবকিছু যথাযথ ব্যবস্থা করা যাতে এগুলো পরিশ্রম ও কষ্টের ফলে দুর্বল হয়ে না পড়ে এবং দুর্বলতার ছাপ যাতে না থাকে। এ সীমা অতিক্রম করলে তা অবসন্নতা, অলসতা ও সময়ক্ষেপণতা হবে এবং এ কারণে বান্দার অনেক কল্যাণ ছুটে যাবে। আবার এর চেয়ে কমতি করলে তা জোরপূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাবে; এমনকি কখনও

[12] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮১৬।

তা নি:শ্বেষ হয়েও যেতে পারে যেমন নার্সারীতে মাটি না থাকলে তা উপড়ে পরে এবং দাড়িয়ে থাকতে পারে না।

অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি দানশীলতার একটি সীমা রয়েছে। সুতরাং যখন এর সীমা পেরিয়ে যাবে তখন তা অপচয় ও অপব্যয় হবে আবার যখন সে সীমার চেয়ে কম করবে তখন তা বখিলতা ও কৃপণতা হয়ে যাবে।

বীরত্বের রয়েছে একটি সীমারেখা। যখন তা অতিক্রম করবে তখন তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, আবার যখন তা পরিমাণের চেয়ে কম হবে তখন তা ভীরুতা ও কাপুরুষতা বলে গণ্য হবে। বীরত্বের সীমা হচ্ছে যেখানে অগ্রগামী হতে হবে সেখানে অগ্রগামী হওয়া আর যেখানে বিরত থাকতে হয় সেখানে বিরত থাকা। যেমন মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ‘আমর ইবর ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেছিলেন, “আপনি কী বীর বা ভীরু তা আমাকে দেখান। আপনি যুদ্ধে এমনভাবে সামনে অগ্রসর হবেন যাতে আমি বলতে পারি যে, আপনি সবচেয়ে সাহসী মানুষ, আবার যদ্ধ থেকে এমনভাবে ভীরুতা দেখাবেন যে যাতে আমি বলতে পারি যে, আপনি সবচেয়ে ভিতু মানুষ। তখন ‘আমর ইবন ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, যখন কোনো সুযোগ গ্রহণ করতে আমি সক্ষম তখন আমি বীর, কিন্তু যদি কোনো সুযোগ আমি গ্রহণ করতে না পারি তখন আমি ভীরু হয়ে যাই।

আত্মসম্মানবোধের একটি পরিধি আছে, কিন্তু তা যখন সীমা অতিক্রম করে তখন তা অপবাদ ও খারাপ ধারণায় পরিণত হয়, আবার যখন তা

পরিমাণের চেয়ে কম হয় তখন তা গাফেলাতি ও অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়।

বিনয়ের রয়েছে একটি সীমারেখা, যখন এ সীমা অতিক্রম করে তখন তা অপমান ও অপদস্ত বলে গণ্য হয়, আবার সে সীমার চেয়ে কম হলে তা দম্ভ ও অহংকারে পরিণত হয়।

সম্মানেরও একটি সীমা রয়েছে। সে সীমা অতিক্রম করলে তা অহংকার ও অসচ্চরিত্র হিসেবে গণ্য হয়, আবার সে সীমার চেয়ে কম করলে তা অপমান ও হীনতায় পরিণত হয়।

এ সব কিছুর মূলনীতি হলো ন্যায়পরায়নতা ও ন্যায়বিচার। তা হলো বাড়াবাড়ি ও কমতির মাঝে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। এর ওপর ভিত্তি করেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধিত হয়; এমনকি শারীরিক কল্যাণও মধ্যম পন্থা অবলম্বন ব্যতীত অর্জিত হয় না। কেননা শরীরের কিছু অংশ যখন মধ্যম পন্থা তথা যথাযথভাবে না পেয়ে কম বা বেশি হয় তখন তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় এবং শক্তিও কমে যায়।

এমনিভাবেই প্রাকৃতিক কার্যসমূহ কাজ করে থাকে। যেমন ঘুমানো, জেগে থাকা, খাওয়া-দাওয়া, পান করা, যৌন কাজ, চলাফেরা, খেলাধুলা, নির্জনে থাকা ও মানুষের সাথে একত্রে থাকা ইত্যাদি যখন অতিরঞ্জিত এবং অতিকম করা এ দুয়ের মাঝামাঝি হয় তখন তা নায্যভাবে হয়ে থাকে; কিন্তু একটি কমতি করলে তখন অপরটিও কমতি হয় এবং এতে ফলাফলেও কমতি দেখা যায়।

পরিচ্ছেদ: অসচ্চরিত্র ও সচ্চরিত্রের মৌলিকদিকসমূহ

সমস্ত অসচ্চরিত্রের মূল হলো অহংকার, অপমান ও নীচুতা। আর সব সচ্চরিত্রের মূল হলো বিনয় ও উচ্চ হিম্মত।

অতএব, অহংকার, অবাধ্যতা, দাম্ভিকতা, অহমিকা, হিংসা, সীমালঙ্ঘন, গর্ব, যুলুম, কঠোরতা, দাপট দেখানো, উপেক্ষা করা, সদুপদেশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা, একচেটিয়া ক্ষমতা দেখানো, উচ্চ পদ কামনা করা, ক্ষমতা ও পদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করা, কাজ না করে মানুষের প্রশংসা কামনা করা ইত্যাদি সব কিছুই অহংকার থেকেই সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে মিথ্যাচার, তুচ্ছতা, খিয়ানত, লোক দেখানো, ষড়যন্ত্র করা, ধোঁকা দেওয়া, উচ্চাভিলাষ, দুশ্চিন্তা, ভীরুতা, কৃপণতা, অক্ষমতা, অলসতা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে নত হওয়া ও উত্তম জিনিসের পরিবর্তে নিম্নমানের জিনিস চাওয়া ইত্যাদি নীচতা, হীনতা ও ছোট মানসিকতা।

আর উত্তম চরিত্র হলো ধৈর্য, বীরত্বতা, ন্যায়পরয়নতা, পুরুষত্ব, পবিত্রতা, রক্ষণাবেক্ষণতা, দানশীলতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, মার্জনা, সম্ভাবনা, অন্যকে প্রধান্য দেওয়া, হীনতা থেকে নিজের আত্মসম্মানবোধ, বিনয়, সল্পেতুষ্টি, সততা, ইখলাস, ইহসানের অনুরূপ বা তার চেয়েও উত্তম প্রতিদান দেওয়া, মানুষের ভুল-ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়া, বেহুদা কাজ বর্জন করা, সব ধরণের অসচ্চরিত্র থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা ইত্যাদি বিনয় ও উচ্চ হিম্মত থেকেই সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা জমিন সম্পর্কে বলেছেন যে, সেটি শুষ্ক, অতঃপর এতে তিনি পানি বর্ষণ করেন,

অতঃপর জমিন সজিব ও উজ্জীবিত হয় এবং এর সৌন্দর্য ও রূপ ধারণ করে। এমনিভাবে সব সৃষ্টি যখন আল্লাহর তাওফীকে তার যথাযথ অংশ প্রাপ্ত হয় তখন তা উত্তম রূপ ধারণ করে।

অন্যদিকে আগুণের বৈশিষ্ট্য হলো উচ্চ-মুখী ও ধ্বংসাত্মক। অতঃপর যখন আগুন নিভে যায় তখন তা সর্বনিকৃষ্ট তুচ্ছ জিনিসে পরিণত হয়। এমনিভাবে সৃষ্টিকুল ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী। যখন ঊর্ধ্বমুখী হয় তখন অস্থিরতায় ভোগে, আবার যখন হীন ও নীচুমুখী হয় তখন তা নিভে যায় ও নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। অসচ্চরিত্র আগুনের অনুগামী এবং তা আগুন থেকে তৈরি। আর সচ্চরিত্র জমিনের অনুগামী এবং তা জমিন থেকে সৃষ্ট। সুতরাং যে ব্যক্তির হিম্মত উচুঁ হবে এবং নিজেকে বিনয়ী করবে সে উত্তম চরিত্রে ভূষিত হবে, আর যে নিম্ন হিম্মতের হবে এবং নিজে অবাধ্য হবে সে অসচ্চরিত্রে ভূষিত হবে।

পরিচ্ছেদ: ইখলাসের উপকরণসমূহ

যে অন্তর মানুষের প্রশংসা ও গুণগান পাওয়ার ভালোবাসা ও লোকদের কাছে কিছু পাওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে সে অন্তরে ইখলাস একত্রিত হয় না, যেমনিভাবে পানি ও আগুন একত্রিত হয় না, গিরগিটি ও তিমি যেমন এক হয় না। তোমার অন্তর যখন ইখলাস অর্জনের কথা বলবে তখন তুমি তোমার অন্তরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে গিয়ে আগে তাকে না পাওয়ার ছুরি দিয়ে জবাই করে দাও। মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তন পাওয়ার আশাকে আখিরাত পাওয়ার প্রেমিকদের যুহুদ তথা তাপস্য করো। তোমার উচ্চাভিলাষকে যখন তুমি জবাই করতে সক্ষম

হবে এবং মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারবে তখন তোমার জন্য ইখলাস অর্জন সহজ হয়ে যাবে।

যদি তুমি জিজ্ঞেস করো, উচ্চাভিলাষ এবং মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে কীভাবে ত্যাগ করা আমার জন্য সহজ? আমি বলল, উচ্চাভিলাষকে খতম করার সহজ উপায় হচ্ছে তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, মানুষ যা কিছুই আশা করে তার ভাণ্ডার আল্লাহর কাছেই রয়েছে, তিনি ব্যতীত কেউ এর মালিক নয়, তিনি ব্যতীত কেউ তা বান্দাহকে দিতে পারে না।

অন্যদিকে মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করার সহজ উপায় হচ্ছে, তোমার অকাট্য ইলম যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো প্রশংসা কোনো উপকারে আসবে না, ব্যক্তিকে সুসজ্জিত করতে পারে না, তিনি ব্যতীত কারো নিন্দা কাউকে ক্ষতিও করতে পারে না। যেমন একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন,

إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ وَإِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

“আমার প্রশংসায়ই একজন প্রশংসিত হয় আর আমার নিন্দায়ই একজন নিন্দিত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এতো আল্লাহ তা‘আলারই এখতিয়ার।”[13] অতএব, যার (মানুষের) প্রশংসায় প্রশংসিত

[13] তিরমিযী, হাদীস নং ৩২৬৭; আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। নাসায়ী, হাদীস নং ১১৫১৫।

হওয়া এবং যার নিন্দায় নিন্দিত হওয়ার কিছু আসে যায় না তার প্রশংসা বা নিন্দা থেকে যুহুদ (বিমূখ হও) করো; বরং যার (আল্লাহর) প্রশংসায় সব কিছু সুন্দর ও প্রশংসিত হয় তার প্রশংসা পেতে আগ্রহী হও এবং যার নিন্দায় সব কিছু নিন্দিত হয় সে নিন্দা থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হও। ধৈর্য ও ইয়াকীন ব্যতীত এগুলো অর্জন করতে সক্ষম হবে না। যখনই তোমার থেকে ধৈর্য ও ইয়াকীন হারিয়ে যাবে তখন তোমার অবস্থা এমন হবে যে, যে ব্যক্তি যানবাহন ব্যতীত অথৈ সমুদ্র পাড়ি দিতে ইচ্ছা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞۖ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٦٠ ﴾ [الروم: ٦٠]

"অতএব, আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা হক। আর যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না তারা যেন তোমাকে অস্থির করতে না পারে।" [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৬০]

﴿ وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤ ﴾ [السجدة: ٢٤]

"আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ২৪]

পরিচ্ছেদ: স্বাদ বা রুচি উপভোগের বিবেচনায় পরিপূর্ণ মানুষ

প্রত্যেক ব্যক্তি জিনিসের স্বাদ তার অবস্থা, হিম্মত ও নফসের সম্মানবোধ অনুসারে আস্বাদন করে থাকে। আত্মার দিক থেকে সর্বাধিক উত্তম আত্মা, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হিম্মত এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাবান আত্মা হলো যে আত্মা আল্লাহর জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, তাঁর ভালোবাসার স্বাদ আস্বাদন করেছে, তাঁর সাথে মিলাত হতে পাগলপনা হয়েছে, তিনি যা ভালোবাসেন ও যেসব কাজে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন সেসব কাজ করতে সে সর্বদা উদগ্রীব থাকে। তার স্বাদই হচ্ছে তাঁর (আল্লাহর) কাছে যাওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তার হিম্মত হচ্ছে তাঁকে পেতে ঝাঁপিয়ে পড়া।

উপরোক্ত স্বাদের উপরোক্ত স্তর ছাড়াও আরো কতগুলো স্তর আছে, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ হিসেব করতে পারবে না; এমনকি কিছু মানুষের এমন নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতম জিনিসের স্বাদ আছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায়। তার কাছে যদি উক্ত স্বাদের জিনিসটি শুরুতে পেশ করা হয় তাহলে সে নিজের জন্য তা গ্রহণ করবে না; এমনকি সেদিকে তাকাবেও না।

রুচির বিবেচনায় সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও উত্তম মানুষ সে ব্যক্তি যার অন্তর, রূহ ও শরীরের মধ্যে সব হালাল জিনিস একত্রিত হয়েছে যা তাকে তার আখিরাতের অংশকে ঘাটতি করে না, তার রবকে জানা ও তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্তির স্বাদকে বিছিন্ন করে না। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قُلۡ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا خَالِصَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ ٣٢﴾ [الاعراف: ٣٢]

“বলুন, তা (সৌন্দর্যোপকরণ) দুনিয়ার জীবনে মুমিনদের জন্য, বিশেষভাবে কিয়ামত দিবসে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৩২]

যার রুচি আখিরাতের সুখ-শান্তি প্রাপ্তিতে বাধা দেয় তার রুচিই হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট রুচি। দুনিয়ার জীবনে তাদের সুখ সামগ্রীগুলো নিঃশেষ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿أَذۡهَبۡتُمۡ طَيِّبَٰتِكُمۡ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنۡيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا٢٠﴾ [الاحقاف: ٢٠]

“(তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ সামগ্রীগুলো নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ২০]

পরিচ্ছেদ: গুনাহ ও পাপ বর্জনের উপকারিতা

রাব্বুল ‘আলামীন মহান আল্লাহর প্রবিত্রতা বর্ণনা করছি। গুনাহ ও পাপাচার বর্জনে দুনিয়াতে ব্যক্তির পুরুষত্ব কায়েম হয়, মান-সম্মান রক্ষা হয়, প্রভাব-প্রতিপত্তি হেফাযত হয়, যে সম্পদ আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের ভিত্তি করেছেন সে সম্পদ রক্ষা হয়, সৃষ্টির ভালোবাসা লাভ হয়, তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়, জীবিকা নির্বাহ প্রতিষ্ঠিত হয়, শরীরের প্রশান্তি অর্জন হয়, অন্তরের খোরাক লাভ হয়, মনের পবিত্রতা অর্জন হয়, ক্বলবের সুখ-শান্তি ও প্রশস্ততা অর্জিত হয়, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ভোগের পরিবর্তে সম্মান অর্জিত হয়, অন্তরের আলো রক্ষা হয় যা গুনার অন্ধকারকে নিভিয়ে দেয়, ফাসিক ও পাপাচারীরা যে সব সংকীর্ণতা ও কঠিনতা ভোগ করে তা থেকে রক্ষা হয়, তার রিযিক

এমনভাবে সহজ হয়ে যায় যা সে কল্পনা করতে পারে না, পাপ ও অন্যায়কারীদের যেসব বালা-মুসিবত ও কঠিনতা হয় তা তার জন্য সহজ হয়ে যায়, তার জন্য আল্লাহর আনুগত্য করতে সহজ হয়, ইলম অর্জন সহজ হয়, মানুষের মাঝে সে উত্তম প্রশংসা লাভ করে, তার জন্য অধিকহারে দো'আ বৃদ্ধি পায়, সে যা অর্জন করে তা উপভোগ করে, মানুষের অন্তরে তার ব্যাপারে ভয়-ভীতির সৃষ্টি হয়, যখন সে অত্যাচারীত ও যুলুমের স্বীকার হয় তখন সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং বিজয়ী হয়, কোনো কুৎসাকারী তার কুৎসা রটনা করলে তা থেকে তার মান-সম্মান রক্ষা হয় ও তার থেকে তা প্রতিহত করা হয়, দ্রুত তার দু'আ কবুল করা হয়, তার ও আল্লাহর মাঝে দূরত্ব দূরীভূত হয়, ফিরিশতাদের নৈকট্য লাভ হয়, মানব ও জীন শয়তান থেকে দূরে থাকে, তার সেবা ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য মানুষ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, তার ভালোবাসা ও সান্নিধ্য লাভের জন্য সবাই কাছে আসে, তার মৃত্যুর ভীতি থাকে না; বরং মৃত্যুতে সে আনন্দিত হয়, কেননা সে মৃত্যুর পরে তার রবের কাছে গমন করছে, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই কাছে, দুনিয়া তার কাছে তুচ্ছ মনে হয় এবং আখিরাত অনেক বড় মনে হয়, বিশাল সম্রাজ্য লাভ ও মহাসফলতা প্রাপ্তি তার আগ্রহ-উদ্দপনা, আনুগত্যের স্বাদ আস্বাদন করে, ঈমানের স্বাদ পায়, আরশ বহনকারী ও এর আশেপাশে অবস্থানরত ফিরিশতাদের দো'আপ্রাপ্ত হয়, তার কৃতকর্ম লেখার কাজে নিয়োজিত ফিরিশতাদ্বয় তার কাজে খুশি হয় এবং সর্বদা তার জন্য দো'আ করে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি, বুঝশক্তি, ঈমান ও জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর ভালোবাসাপ্রাপ্ত হয়,

তাঁর সমীপে সে এগিয়ে যায়, তাঁর কাছে তাওবা করতে আনন্দবোধ করে। সে এমনভাবে মহাপ্রতিদানপ্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হবে যে গুনাহ করার আনন্দের তার তুলনাই হয় না।

এগুলো হলো দুনিয়াতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কিছু প্রতিদান ও প্রভাব। আর সে যখন মারা যাবে তখন ফিরিশতারা তাকে তার রবের পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবে, তারা বলবে, তার কোনো ভয় নেই এবং চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাকে দুনিয়ার জেলখানা ও সংকীর্ণতা থেকে আখিরাতে জান্নাতের বাগানে নিয়ে যাবে এবং সেখানে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত থাকবে। কিয়ামতের দিন যখন মানুষ প্রচণ্ড গরম ও ঘামে হাবুডুবু খাবে তখন সে আরশের ছায়ায় থাকবে। আল্লাহর কাছ থেকে ফিরে এসে সে ডান হাতে আমলনামা পাবে এবং আল্লাহর প্রিয় মুত্তাকি ও সফলকাম ব্যক্তিদের সাথে থাকবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ [الحديد: 21، والجمعة: ٤]

"এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২১ এবং সূরা আল-জুমু'আ, আয়াত: ৪]

পরিচ্ছেদ: সৃষ্টিকুলের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রয়োজনীয়তা

যেহেতু আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষীতার মর্যাদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ করেছেন। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টি দুনিয়া ও আখিরাতে তার প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী ও অভাবী। দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা তাদের পানাহার ও শরীরের জীবন বহনকারী আত্মার চেয়েও অধিক প্রয়োজন। আর আখিরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মানুষের প্রয়োজনীয়তা হলো, কিয়ামতের দিবসের ভয়াবহ অবস্থা ও কঠিন মুহুর্ত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তারা রাসূলদেরকে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করবেন; কিন্তু কোনো রাসূলই কথা বলতে এগিয়ে আসবেন না। তখন শুধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য শাফায়াত করবেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলবেন।

পরিচ্ছেদ: সৌভাগ্য ও সফলতার আলামতসমূহ

সৌভাগ্য ও সফলতার অন্যতম আলামত হলো, বান্দার জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে তার বিনয় ও দয়া তত বৃদ্ধি পাবে। আবার তার আমল যত বৃদ্ধি পাবে তার ভয় ও সতর্কতা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। তার বয়স যত বৃদ্ধি পাবে তার বেঁচে থাকার আগ্রহও তত কমে যাবে, তার সম্পদ যত বেশি হবে তার বদান্যতা ও ব্যয়ও তত বেশি হবে, তার ক্ষমতা ও সুনাম-সুখ্যাতি যত বৃদ্ধি পাবে মানুষের নৈকট্য লাভ, তাদের অভাব-অভিযোগ পূরণ এবং তাদের কাছে বিনয় প্রকাশও তত বৃদ্ধি পাবে।

অন্যদিকে দুর্ভাগ্য ও হতভাগ্যের আলামত হচ্ছে, বান্দার জ্ঞান যখন বৃদ্ধি পাবে তখন তার অহংকার ও দাম্ভিকতা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে, আবার তার আমল বেশি হলে তার গর্ববোধও বেড়ে যায়, অন্য মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং নিজে নিজেকে অনেক ভালো মনে করে। তার বয়স বৃদ্ধি পেলে আরো বাঁচতে আশা করে, সম্পদ বেশি হলে কৃপণতা ও সম্পদ মুঠো করে রাখার প্রবণতাও বেড়ে যাবে, তার ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুনাম-সুখ্যাতি যত বৃদ্ধি পাবে তার অহংকার ও দাম্ভিকতাও তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

এসব বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ, তিনি বান্দাকে এ পরীক্ষা দ্বারা যাচাই বাছাই করে থাকেন। একদল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সফলকাম হয় আরেকদল ফেল করে দুর্ভাগা হয়।

এমনিভাবে মান-সম্মান পাওয়াও আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। যেমন, রাজত্ব, ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সুলাইমান 'আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে বলেন, তিনি যখন বিলকিসের রাজ সিংহাসন তার দরবারে দেখলেন তখন তিনি বলেছিলেন,

﴿هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [النمل: 40]

"এটি আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।" [সূরা আন-নামাল, আয়াত: ৪০]

সুতরাং নি'আমত আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরণের বালা-মুসিবত ও পরীক্ষা, এতে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ তা প্রকাশ পায়। এমনিভাবে বিপদে-আপদে পতিত হওয়াও আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা, তিনি নি'আমত দান করে পরীক্ষা করেন আবার বালা-মুসিবত দিয়েও পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَنِ ۝١٥ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ ۝١٦ كَلَّا......﴾ [الفجر: ١٥، ١٧]

"আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার ওপর তার রিযিককে সঙ্কুচিত করে দেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন। কখনো নয়.....।" [সূরা আল-ফাজর, আয়াত: ১৫-১৭] অর্থাৎ আমি যাকে প্রশস্ততা দান করেছি, সম্মানিত করেছি ও নি'আমত প্রদান করেছি তা সর্বদা তার জন্য সম্মান নয়; এমনিভাবে আবার যাকে আমি রিযিকে সঙ্কুচিত করেছি ও পরীক্ষা করেছি তা তাকে অসম্মান করার জন্য নয়।

পরিচ্ছেদ: কুফুরীর চার রুকন

কুফুরীর রুকন চারটি। সেগুলো হচ্ছে: অহংকার, হিংসা, রাগ ও প্রবৃত্তি।

অহংকার ব্যক্তিকে আনুগত্য করা থেকে বিরত রাখে, হিংসা তাকে সদুপদেশ গ্রহণ ও প্রদান করতে বাধা দেয়, রাগ তাকে ন্যায় বিচারে বাধা দেয় এবং প্রবৃত্তি ইবাদতে নিমগ্ন হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে।

এ চারটির মূল উৎপত্তি হলো ব্যক্তির অজ্ঞতা ও মূর্খতা; কেননা সে যদি তার রবকে তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলী ও মহান বৈশিষ্ট্য সহকারে যথাযথভাবে চিনত এবং নিজের অপূর্ণাঙ্গতা, কমতি ও দোষ-ত্রুটি বুঝত তাহলে সে কখনও অহংকার করত না, কারো ওপর রাগ হতো না, আল্লাহর যাকে দান করেন তাতে সে হিংসা করত না। কেননা প্রকৃতপক্ষে হিংসা তো হচ্ছে আল্লাহর সাথে একধরণের শত্রুতা। আল্লাহ যে বান্দাকে নি'আমত দিতে ভালোবাসেন সে তাকে সে নি'আমত প্রদান অপছন্দ করে এবং সে তার থেকে উক্ত নি'আমত চলে যাওয়া পছন্দ করে; অথচ আল্লাহ তা অপছন্দ করেন। আল্লাহর ফয়সালা, তাঁর বণ্টন, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির বিপরীত হলো কাউকে হিংসা করা। আর এ কারণেই ইবলিস তাঁর প্রকৃত শত্রুতে পরিণত হয়েছে। কেননা তার অপরাধের মূল ছিল অহংকার ও হিংসা।

এ দু'টি দোষ থেকে মুক্তির উপায় হলো আল্লাহর জ্ঞানার্জন, তাঁর তাওহীদ শিক্ষা, তাঁর বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর প্রতি সর্বদা বিনয়ী ও অনুগত থাকা। রাগের ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকার উপায় হলো নিজেকে চেনা, কারো ওপর রাগ করা বা কারো থেকে প্রতিশোধ নেয়ার তার কোনো অধিকার নেই, এ বিষয়টি জানা। কেননা নিজেকে চেনার মাধ্যমে

স্রষ্টার বণ্টনে সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট থাকা এটি তার নিজের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করা।

এসব ব্যাধি থেকে মুক্তির সর্বোত্তম পন্থা হলো, নিজেকে এভাবে অভ্যস্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা জন্য কারো ওপর ক্রোধান্বিত হওয়া ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই কারো প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। অতএব, কারো অন্তরে আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারো প্রতি সন্তুষ্ট থাকা প্রবিষ্ট করলে তার অন্তর থেকে অন্যের ওপর রাগ হওয়া ও সন্তুষ্টি থাকা দূরীভূত হয়ে যাবে। বিপরীতভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগ বা সন্তুষ্ট না থাকলে তার অন্তরে বিপরীতমূখী রাগ ও সন্তুষ্ট থাকবে (যা তাকে ধ্বংস করে দেয়)।

অন্যদিকে, প্রবৃত্তির ঔষধ হচ্ছে সঠিক জ্ঞানার্জন ও জানা। তা এভাবে যে, ব্যক্তির প্রবৃত্তি তার সঠিক জ্ঞানার্জন ও জানার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা এবং এ কারণে সে সঠিক জ্ঞান লাভ ও জানা থেকে বঞ্চিত হয়। প্রবৃত্তিকে দমন করা সঠিক জ্ঞান ও জানার উৎকৃষ্ট উপায়। অতএব, যখনই তুমি প্রবৃত্তির পথ খুলে দিবে ততই তুমি সঠিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে, আর প্রবৃত্তির পথ যখনই বন্ধ করে দিবে তখনই তুমি সঠিক জ্ঞানের দিকে সর্বদিক থেকে দ্রুত ধাবিত হবে।

মানুষের রাগ হিংস্র জন্তুর ন্যায়। হিংস্র জন্তু যেমন কাউকে নির্জনে কায়দায় পেলে তাকেই শুরুতে খাওয়া শুরু করে, তেমনিভাবে রাগও তাকে খেয়ে ফেলে (তার আমল নষ্ট করে দেয়)। আর প্রবৃত্তি আগুনের মত। কোন ব্যক্তি আগুন প্রজ্বলিত করলে তাকেই শুরুতে আগুন ভস্মিত

করে। অহংকার সম্রাজ্যের প্রতিপক্ষ শত্রুর মত, সে তোমাকে ধ্বংস করতে না পারলেও তোমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। হিংসা তোমার চেয়ে শক্তিশালী শত্রুর মতো। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তি ও রাগের ওপর জয়লাভ করে, শয়তান তার ছায়া দেখেও ভীত [14] হয়। আর যার ওপর তার প্রবৃত্তি ও ক্রোধ বিজয় লাভ করে তার চিন্তাভাবনা ও কল্পনা কিছুই শয়তান ভয় পায় না।

পরিচ্ছেদ: জীবনের চারাগাছ

মানব জীবনে একটি বছর গাছের মতো, মাস হলো এর শাখা-প্রশাখা, দিন হলো ডালপালা, ঘণ্টা হলো এর পাতা এবং নিঃশ্বাস হলো এর ফল। সুতরাং যার প্রতিটি নিঃশ্বাস আল্লাহর অনুগত্যে অতিবাহিত করবে তার বৃক্ষে উত্তম ফল দিবে। আর যার নিঃশ্বাস গুনাহ ও অবাধ্যতায় কাটবে তার বৃক্ষ তেতো ফল দিবে। ফসল কাটা হবে কিয়ামতের দিনে। তখন স্পষ্ট হবে তার বৃক্ষের ফল মিষ্টি ছিল না তেতো।

ইখলাস ও তাওহীদ অন্তরের বৃক্ষ। কর্ম হচ্ছে এর শাখা-প্রশাখা, আর এর ফলাফল হলো দুনিয়াতে উত্তম জীবন যাপন এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী নি'আমত লাভ। জান্নাতের ফল যেমন শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয় তেমনিভাবে তাওহীদ ও ইখলাসের ফলও দুনিয়া ও আখিরাতে শেষ হবার নয়।

[14] يفرق শব্দের অর্থ ভয় করা, চিন্তিত হওয়া। দেখুন, আন-নিহায়া, ৩/৪৩৮।

শির্ক, মিথ্যাচার ও লৌকিকতা অন্তরের বৃক্ষ। দুনিয়াতে এর ফল হচ্ছে ভয়-ভীতি, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ও অন্তরের ঘোর অমানিশা। আর আখিরাতে এর ফলে ব্যক্তি প্রাপ্ত হবে যাক্কূম বৃক্ষের ফল ও স্থায়ী আযাব। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইবরাহীমে এ দুধরণের বৃক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন।

পরিচ্ছেদ: রূহের জীবন

আদম 'আলাইহিস সালামের শরীর জমিন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর তার রূহ ঊর্ধ্বজগত থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং উভয়ের মাঝে সমন্বয় করা হয়েছে। যখন তার শরীর রূহকে কাজের মাধ্যমে ক্ষুধার্ত রাখে, তাকে জাগিয়ে রাখে এবং নানা কাজে তাকে ব্যস্ত রাখে তখন তার রূহ হালকা ও আরাম অনুভব করে এবং সে যেখান থেকে সৃষ্ট হয়েছে সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছা পোষণ করে, সে ঊর্ধ্বজগতে ফিরে যেতে চায়। আর শরীর যখন তৃপ্ত করে, তাকে আরাম-আয়েশে রাখে, তাকে ঘুম পড়িয়ে রাখে, তার খেদমত ও বিশ্রামের কাজে নিয়োজিত থাকে তখন শরীর তাকে যেখান থেকে সৃষ্ট হয়েছে সেখানে স্থায়ী করে (অর্থাৎ জমিনে স্থায়ী করে রাখে)। তখন শরীরের সাথে রূহের সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, ফলে তা একধরণের জেলখানায় পরিণত হয়। রূহ যদি সেখানে খাদ্য না পায় তখন সে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঊর্ধ্বজগতে মিলিত হয়ে এমনভাবে চিৎকার ও সাহায্য কামনা করে যেমনিভাবে শাস্তিভোগকারী ব্যক্তি চিৎকার ও সাহায্য প্রার্থনা করে।

মূলকথা, শরীর যত হালকা হয় রূহ তত সূক্ষ্ম ও হালকা হয় এবং তখন সে ঊর্ধ্বজগতে ফিরে যেতে আশা করে। আর শরীর যত ভারী হয় এবং প্রবৃত্তি ও আরাম-আয়েশের প্রতি স্থায়ী করে রাখতে চায়, তখন রূহও তত ভারী হয় ও ঊর্ধ্বজগত থেকে নিম্ন জগতে ছিটকে পড়ে এবং তখন তা নিম্ন ভূমির বস্তুতে পরিণত হয়।

পরিচ্ছেদ: আল্লাহর পরিচয়ের প্রকারভেদ

আল্লাহর পরিচয় দু'ধরণের।

প্রথম প্রকার: তাঁকে স্বীকার করার জ্ঞান; এ প্রকারের পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ, বাধ্য-অবাধ্য সকলেই সমান।

দ্বিতীয় প্রকার: তাঁর এমন পরিচয় লাভ যা তাঁর থেকে লজ্জাবোধ, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর সাথে অন্তর সম্পৃক্ত থাকা, তাঁর সাথে মিলিত হতে অধীর আগ্রহে থাকা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর দিকে বিনীতভাবে ফিরে যাওয়া, তাঁর প্রতি বিনয়ী হওয়া এবং সৃষ্টির কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থেকে তাঁর কাছেই চাওয়া ইত্যাদির জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয় করে।

আল্লাহর এ ধরণের পরিচয় লাভ দু'টি প্রশস্ত অধ্যয়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যয়: সামগ্রিকভাবে কুরআনের সব আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে চেনা ও জানা।

দ্বিতীয় অধ্যয়: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাক্ষ্য বহনকারী বিশেষ আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা, এর অন্তর্নিহিত আল্লাহর হিকমত, তাঁর কুদরত, সূক্ষ্মতা, ইহসান, ন্যায়পরায়ণতা এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর ন্যায় বিচার ইত্যাদি নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করা।

এসব কিছুর সারনির্যাস হলো আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ, তাঁর মহত্ব, পূর্ণতা, এসব গুণে তাঁর এককত্ব ইত্যাদি গভীরভাবে অনুধাবন করা। সৃষ্টির সাথে তাঁর সম্পর্ক ও তাদের প্রতি তাঁর আদেশ-নিষেধ গভীরভাবে বুঝা, এতে সে তাঁর আদেশ ও নিষেধসমূহ সম্পর্কে ফকীহ তথা গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবে, তাঁর ফয়সালা ও কুদরত সম্পর্কে ফকীহ হবে, তাঁর নাম ও সিফাতসমূহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবে, দীনি ও শর'ঈ বিধান এবং বৈশ্বিক ও মানব রচিত বিধানের মধ্যকর পার্থক্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারবে। এ সব জ্ঞান লাভ করা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে এ অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহদাতা।

পরিচ্ছেদ: দিরহাম তথা অর্থের প্রকারভেদ

মানুষের অর্জিত দিরহাম বা অর্থকড়ি চার ধরণের।

১. যে দিরহাম আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে (সৎভাবে) এবং আল্লাহর হক আদায়ে ব্যয় করা হয়েছে, সে সব দিরহাম হচ্ছে সর্বোত্তম দিরহাম।

২. যা আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানীর মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে এবং আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যয় করা হয়েছে তা হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট দিরহাম।

৩. যে দিরহাম মুসলিমকে কষ্ট দিয়ে অর্জিত হয়েছে এবং মুসলিমকে কষ্ট দেওয়ার কাজে ব্যয় করা হয় তাও নিকৃষ্ট দিরহাম।

৪. আর যেসব দিরহাম জায়েয পন্থায় অর্জন করে জায়েয প্রবৃত্তির কাজে ব্যয় করা হয়েছে তা ব্যক্তির উপকারেও আসে নি বা তার বিপক্ষেও যায় নি।

এগুলো হলো অর্থকড়ির মানদণ্ড। এ ছাড়াও কয়েক ধরণের দিরহাম রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: কিছু দিরহাম সৎভাবে অর্জিত হয়েছে; কিন্তু অন্যায় পথে ব্যয় হয়েছে, আবার কিছু দিরহাম অন্যায়ভাবে অর্জিত হয়েছে; কিন্তু সৎপথে ব্যয় হয়েছে। এ ধরণের অর্জন ও ব্যয় একটি অন্যটির কাফফারা স্বরূপ। যে দিরহাম সন্দেহ-সংশয়ের পথে অর্জিত হয় সেটির কাফফারা হলো সৎপথে ব্যয় করা।

অর্থকড়ি ব্যয়ের সাথে যেভাবে সাওয়াব, শাস্তি, প্রশংসা ও নিন্দা সম্পৃক্ত তেমনি সেগুলো উপার্জনের সাথেও এসব দোষ-গুণ জড়িত। ব্যক্তি কোথা থেকে অর্থ উপার্জন করেছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে সব কিছুই জিজ্ঞাসিত হবে।

পরিচ্ছেদ: মুমিনদের প্রতি সমবেদনার ধরণ

এক মুমিনের প্রতি অন্য মুমিনের সমবেদনা কয়েক ধরণের হতে পারে। যেমন, টাকা পয়সার দ্বারা সমবেদনা, সুনাম-সুখ্যাতির মাধ্যমে সমবেদনা,

শারীরির ও সেবা প্রদান করে সমবেদনা, সদুপদেশ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সমবেদনা, দো‘আ ও ইসতিগফার করে তাদের প্রতি সমবেদনা, তাদের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে সমবেদনা প্রকাশ। ঈমানের পরিমাণ অনুসারে এসব সমবেদনা বাড়তি ও কমতি হয়। ঈমান দুর্বল হলে সমবেদনাও তত দুর্বল হয়, আর ঈমান মজবুত হলে সমবেদনাও তত মজবুত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সমস্ত সাথীদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তাঁর প্রতি সাহাবীদের অনুসরণের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের প্রতি সমবেদনা ছিল।

পরিচ্ছেদ: নি‘আমতের প্রকারভেদ

নি‘আমত তিন ধরণের।

১. বান্দা কতিপয় নি‘আমত প্রাপ্ত হয় এবং সে তা বুঝতে পারে।

২. কিছু নি‘আমত এখনও প্রাপ্ত হয় নি; সে সেগুলো পাওয়ার আশাবাদী।

৩. কতিপয় নি‘আমত বান্দা প্রাপ্ত হয়েছে; কিন্তু সে তা বুঝতে পারে না।

আল্লাহ কোনো বান্দাকে নি‘আমত পরিপূর্ণ করতে চাইলে তাকে তার প্রাপ্ত বর্তমান নি‘আমত সম্পর্কে অবহিত করান, তাকে নি‘আমতের শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দান করেন যাতে তার নি‘আমত দূরীভূত হয়ে না যায়। কেননা গুনাহের কারণে নি‘আমত চলে যায় এবং শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে নি‘আমত বলবৎ থাকে। তাকে প্রতিক্ষীত নি‘আমত লাভের জন্য আরো ভালো কাজ করার তাওফীক দান করেন, নি‘আমত লাভের প্রতিবন্ধকতা ও যে কারণে নি‘আমত ছুটে যায় তাকে

সে পথ দেখান এবং সে পথ বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন। এভাবে তাকে পরিপূর্ণ নি'আমতে ভরপুর করে দেন এবং তাকে প্রাপ্ত নি'আমত সম্পর্কে অবহিত করান, যা সে বুঝতে পারে না।

গুরুত্বপূর্ণ কায়েদা: মনের ইচ্ছা (ঝোঁক) ও কল্পনার গুরুত্ব

সব ধরণের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও স্বাধীন স্বেচ্ছামূলক কাজের মূলভিত্তি হলো মনের ইচ্ছা (ঝোঁক) ও চিন্তা-ভাবনা। কেননা এর থেকে কল্পনার সৃষ্টি হয় এবং কল্পনা ইচ্ছার প্রতি আহ্বান করে। ইচ্ছাশক্তি কাজ বাস্তবে সংঘটিত হওয়া কামনা করে। এভাবে বারবার হলে অভ্যাসে পরিণত হয়।

সুতরাং উপরোক্ত স্তরগুলোর সংশোধন মনের ঝোঁক ও চিন্তা-ভাবনা থেকেই শুরু হয়। মনের ঝোঁক ও চিন্তা-ভাবনা ঠিক হলে অবশিষ্ট স্তরগুলো সঠিক হয়। মনের ঝোঁক ও চিন্তা-ভাবনার সংশোধন সর্বদা এর মালিক আল্লাহ তা'আলার দেখাশুনায় হয়ে থাকে। তাঁর সন্তুষ্ট ও ভালোবাসায় তা বাড়তে থাকে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার থেকেই সব কল্যাণ, তাঁর থেকেই সব হিদায়াত, তাঁর তাওফীকেই সব পথনির্দেশনা, তাঁর অভিভাবকত্বেই বান্দার সব সংরক্ষণ ও হিফাযত, তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেওয়াতেই সব ভ্রষ্টতা, দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা। অতএব, আল্লাহর নিদর্শন, নি'আমত, তাওহীদ, তাঁকে জানার পন্থা, তাঁর 'উবুদিয়্যাতের পন্থা বুঝা, তাঁকে হাযির (উপস্থিত), বান্দার কাজে সাক্ষ্য ও প্রত্যক্ষদর্শী মনে করা, তার ওপর আল্লাহর পর্যবেক্ষণ, তার মনের সব কামনা, বাসনা, ইচ্ছা ও চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে আল্লাহ অবগত

আছেন, এটি যখন সে বুঝবে তখন অন্যায় করতে আল্লাহর থেকে লজ্জাবোধ করবে এবং তিনি আবার তার দোষ-ত্রুটি সৃষ্টিকুলের কারো কাছে প্রকাশ করে দেয় কী না সে কারণে তাঁকে ভয় পাবে অথবা সে নিজের মনে লুকায়িত এসব দোষ-ত্রুটি নিয়ে ভাববে যে মানুষ জানতে পারলে তাকে ঘৃণা করবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে বান্দার চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা অনুসারে সে কল্যাণ, হিদায়াত ও পথনির্দেশনাপ্রাপ্ত হবে।

জেনে রাখুন, মানুষের মনের কল্পনা ও ওয়াসওয়াসার আনুসঙ্গিকতা চিন্তা-ভাবনার দিকে নিয়ে যায়, অতঃপর চিন্তা-ভাবনা তাকে উপদেশের দিকে নিয়ে যায়, উপদেশ তখন তাকে ইরাদা তথা ইচ্ছার দিকে নিয়ে যায়, অতঃপর, ইচ্ছা তাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কাজের দিকে নিয়ে যায়, অতঃপর তা দৃঢ় হয়, ফলে তা ‘আদা তথা অভ্যাসে পরিণত হয়। অতএব, মানুষের মনের কল্পনা ও ওয়াসওয়াসাকে দৃঢ় ও পরিপূর্ণ হওয়ার পরে তা বিচ্ছিন্ন না করে মূলের দিকে ফিরানো অধিক সহজ।

তোমার মনের বাসনাকে যদি তুমি তাড়িয়ে দাও তাহলে সে তোমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে, আর যদি মনের বাসনাকে গ্রহণ করো তখন তা মনের মধ্যে ঘূর্ণয়মান চিন্তা-ভাবনা হিসেবে দেখা দিবে। অতএব, ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করো, তাহলে তা (ইচ্ছাশক্তি) ও চিন্তাশক্তি তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। আর তুমি যদি তাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হও তাহলে তা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির সাথে ফিরে যাবে।

সাবধান! শয়তানকে তোমার চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছাশক্তির স্থানে কাজ করার ক্ষমতা দিওনা; কেননা সে তোমার চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছাশক্তিকে এমনভাবে নষ্ট করবে যা বুঝা বড় কঠিন। সে তোমার অন্তরে নানা ধরণের ওয়াসওয়াসা দিবে এবং ধ্বংসাত্বক চিন্তা-ভাবনা ঢেলে দিবে। সে তোমার ও তোমার উপকারী চিন্তা-ভাবনার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তোমার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে ও তোমার ইচ্ছাশক্তিতে মালিকানা বানাতে তুমিই তাকে সাহায্য করেছ।

যার অন্তরে শয়তান বাসা বাঁধে তার সবধরণের চিন্তা-ভাবনা থেকে শয়তান বের হয় না অথবা নানা ধরণের অশ্লীলতা ও হারাম জিনিসের চিন্তা-ভাবনার অধিকারী হয় অথবা এমনসব কাল্পনিক অনুমান করে যার কোনো ভিত্তি নেই অথবা ভ্রান্ত সব চিন্তা-ভাবনার অধিকারী হয় অথবা তার জ্ঞানের পরিধির বাইরে এমন সব জিনিসের চিন্তা করে যা অনুধাবন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তখন শয়তান তার অন্তরে সেসব কাল্পনিক চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় যার কোন কূল-কিনারা নেই এবং সে এর শেষ সীমানায় পৌঁছতে পারে না। তখন তার চিন্তা-ভাবনার ময়দানে সেসব কাল্পনিক বিয়ষগুলো ঘূর্ণায়মান করতে থাকে।

এসব কিছু সংশোধনের উপায় হলো: তুমি তোমার চিন্তা শক্তিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উপকারী ভাবনার কাজে ব্যাপৃত রাখো, যেমন তাওহীদের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানসমূহ, তার অধিকারসমূহ, মৃত্যু ও এর পরবর্তী জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ, কাজের দোষ-ত্রুটি ও তা থেকে উত্তরণের উপায়, ইচ্ছাশক্তি ও প্রত্যয়েয় ক্ষেত্রে তোমার উপকারে আসে এমন সব

চিন্তা-ভাবনা করো এবং যেসব জিনিস তোমাকে ক্ষতি করে সেসব জিনিসের ইচ্ছা ছুঁড়ে ফেলো।

‘আরেফীন তথা আল্লাহর পরিচয় লাভকারী আলিমদের মতে, খিয়ানতের আশা করা ও মনের চিন্তা-ভাবনায় খিয়ানতের কাজ করা অন্তরের জন্য স্বয়ং খিয়ানত করার চেয়েও অধিক মারাত্মক ও ক্ষতিকর। বিশেষ করে অন্তর যখন খিয়ানতের কাজ করে তখন অন্তরে খিয়ানতের আকাঙ্খা করা মানে এ কাজে অন্তরকে ব্যাপৃত রাখা ও খিয়ানতের দ্বারা অন্তরকে ভরে রাখা এবং তার চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছা সবকিছুই খিয়ানতের হবে।

ফায়েদা: নি‘আমতপ্রাপ্ত হলে তা থেকে বিরক্ত হইও না

মানুষের সাধারণ সূক্ষ্ম একটি দোষ হলো, আল্লাহ বান্দাকে কোন নি‘আমত দান করলে এবং সেটি তার জন্য তিনি পছন্দ করলে সে উক্ত নি‘আমতে বিরক্ত হয়ে সে যেটি ভালো মনে করে (তার অজ্ঞতার কারণে) ও তার জন্য কল্যাণকর ভাবে সেটিতে পরিবর্তন করতে আশা করে। অথচ তার রব তাকে সে নি‘আমত থেকে বঞ্চিত না করে তার অজ্ঞতা ও নিজের জন্য নিকৃষ্ট পছন্দের জন্য তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন; এমনকি বান্দা যখন উক্ত নি‘আমতকে তার জন্য সংকীর্ণতা মনে করে, এটির ওপর রাগান্বিত হয়, এর থেকে নিষ্কৃতি চায় ও নিজে বিরক্ত হয় তখন আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে উক্ত নি‘আমত ছিনিয়ে নেন। বান্দা যখন তার প্রত্যাশিত ও পছন্দনীয় বিষয় ও তার পূর্বের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখতে পায় তখন তার অস্থিরতা, অনুশোচনা ও পূর্বের নি‘আমত আবার ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা চরমভাবে বেড়ে যায়। আল্লাহ

কোন বান্দার কল্যাণ ও হিদায়াত দান করতে চাইলে যে জিনিসে তাঁর নি'আমত ও সন্তুষ্টি আছে তা তাকে দেখান এবং তাকে উক্ত জিনিসের শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক দান করেন। যখন সে উক্ত নি'আমত পরিবর্তনের কথা ভাবেন তখন সে আল্লাহর সাথে ইসতিখারা (আল্লাহর পছন্দ কামনা করেন) করেন, যেহেতু কোনটি তার জন্য কল্যাণকর তা বুঝতে সে অজ্ঞ ও অক্ষম, তখন সে বিষয়টি আল্লাহর ওপর সোপর্দ করেন এবং তার জন্য যেটি উত্তম সেটি তাঁর (আল্লাহর) কাছে কামনা করেন।

আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতের ওপর বিরক্ত হওয়ার চেয়ে বান্দার জন্য ক্ষতিকর কিছুই হতে পারে না। কেননা সে উক্ত নি'আমতকে নি'আমতই মনে করে না এবং এজন্য উক্ত নি'আমতের কারণে শুকরিয়াও আদায় করে না ও আনন্দিতও হয় না; বরং সে এর ওপর ক্রোধান্বিত হয়, এ কারণে অভিযোগ করে ও এ নি'আমতকে মুসিবত মনে করে। অথচ এটি তার ওপর আল্লাহর বিরাট নি'আমত। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতের শত্রু, তাদের ওপর আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতকে অনুধাবনও করে না; বরং তারা তাদের অজ্ঞতা ও যুলুমের কারণে সে নি'আমত প্রতিহদ ও দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। কত নি'আমত তার কাছে এসেছে আর সে তা অস্বীকার করে প্রতিহত করতে চেষ্টা করছে! আবার কত নি'আমত তার কাছে এসেছে; কিন্তু সে তার যুলুম ও অজ্ঞতার কারণে তা দূরীভূত করতে প্রচেষ্টা করেছে! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرٗا نِّعۡمَةً أَنۡعَمَهَا عَلَىٰ قَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ٥٣﴾ [الانفال: ٥٣]

“তা এ জন্য যে, আল্লাহ কোন নিআমতের পরিবর্তনকারী নন, যা তিনি কোন কাওমকে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা পরিবর্তন করে তাদের নিজদের মধ্যে যা আছে।” [সূরা আল- আনফাল, আয়াত: ৫৩]

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ١١﴾ [الرعد: ١١]

“নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।” [সূরা আর-রা‘আদ, আয়াত: ১১]

নিজের চেয়ে অন্য কেউ তার নি‘আমতের শত্রু নেই। সে স্বীয় নি‘আমতের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও নিজেই আবার এর সাহায্যকারী। সুতরাং তার শত্রুতা তার নি‘আমতের মাঝে আগুন নিক্ষেপ করে এবং সে এতে ফুঁ দেয়। আবার তার শত্রুতা তাকে আগুন নিক্ষেপ করাতে সক্ষম করে এবং এতে ফুঁৎকার দিতে সাহায্য করে। যখন অগ্নিশিখা মারাত্মকরূপ ধারণ করে তখন সে অগ্নিনির্বাপক সাহায্যকারী দলের সাহায্য প্রার্থনা করে। অথচ তার উদ্দেশ্য খারাপ ও নিকৃষ্ট ছিল।

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম ব্যক্তি সুযোগ হাতছাড়াকারী, যখন ব্যাপারটি হাতছাড়া হয়ে যায় তখন সে তাকদীরকে দোষারোপ করে।

পরিচ্ছেদ: আল্লাহর সাথে (কৃত ওয়াদা পালনে) সততা

বান্দা সকল কাজে তার রবের সাথে সততা বজায় রাখা ও দৃঢ়প্রত্যয়ী থাকার চেয়ে অধিক উপকারী কিছুই নেই। সে তার সিদ্ধান্তে ও কাজে-কর্মে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করতে দৃঢ় সংকল্প থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَإِذَا عَزَمَ ٱلۡأَمۡرُ فَلَوۡ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ ٢١﴾ [محمد : ٢١]

"অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করত, তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত।" [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২১]

কৃত সংকল্প ও কর্ম বাস্তবতায় পরিণত করার মধ্যেই রয়েছে বান্দার সুখ-সৌভাগ্য। অতএব, সংকল্প সত্যে পরিণত বলতে বুঝায় একে একত্রিত করা, দৃঢ়ভাবে সংকল্প করা এবং এ ব্যাপারে দ্বিধা-সংশয় না করা; বরং এমন দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করা যাতে সংশয়ের কোন লেশ থাকবে না এবং গড়িমসিও থাকবে না। যখন তোমার সংকল্প সত্যিকারে হলো এখন কাজ বাস্তবে পরিণত করা অবশিষ্ট রইল। আর কাজ সত্যে পরিণত করতে হলে তাকে শক্তি ও সামর্থ ব্যয় করতে হবে এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কোন অবস্থাতেই পিছ পা হওয়া যাবে না। অতএব, নিয়াতের দৃঢ়তা তাকে দুর্বল ইচ্ছা ও হিম্মতের বাঁধাদানকারী এবং কাজ সত্যে পরিণত করার সংকল্প তাকে অলসতা ও দুর্বলতা প্রকাশে বাঁধা প্রদান করে।

যে ব্যক্তি সব কাজে আল্লাহর সাথে ওয়াদা পালনে দৃঢ় সংকল্প ও সততা দেখায়, তখন তিনি অন্যদের জন্য যা কিছু দান করেন তার চেয়েও বেশি তাকে দান করেন। এ সততা মানে যা সঠিক ইখলাস ও সঠিক তাওয়াক্কুরের সাথে একত্রিত হয়। অতএব, সর্বাধিক সৎব্যক্তি তিনি যিনি ইখলাস ও তাওয়াক্কুলে সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

পরিচ্ছেদ: মারাত্মক যুলুম ও অজ্ঞতা

সর্বাধিক মারাত্মক যুলুম ও অজ্ঞতা হলো, মানুষের কাছে মান-সম্মান ও মর্যাদা তালাশ করা অথচ তোমার অন্তর আল্লাহকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা থেকে বিমুখ (অর্থাৎ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরোয়া করে না)। সৃষ্টিকুলকে সম্মান ও তাকে মর্যাদা দেওয়া যেন মনে হয় তুমি আল্লাহকে সম্মান ও মর্যাদা দিচ্ছ না ও তার আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরোয়া করছ না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ما لَكُمۡ لَا تَرۡجُونَ لِلَّهِ وَقَارٗا ۝١٣﴾ [نوح: ١٣]

"তোমাদের কী হল, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরোয়া করছ না?" [সূরা নূহ, আয়াত: ১৩]

এখানে উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর বাণীকে ও তিনি যে ইলম ও হিকমত দান করেছেন সেগুলোকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করে না, সে কীভাবে মানুষের থেকে সম্মান ও মর্যাদা প্রত্যাশা করে? আল-কুরআন, ইলম ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে রয়েছে সত্যের সম্পর্ক, সতর্কতা, অন্যায় থেকে বাধাদান ও বিরত

থাকার ধমক, তোমার জন্য বিজ্ঞজনের দৃঢ় সতর্কতা, অতন্দ্র প্রহর ও বাধাদান। সুতরাং এতে যা কিছু এসেছে তা তোমার জন্য উপদেশ, এবং যা কিছু তোমাকে বাধা দেয় তা তোমার জন্য নসিহত। এতদসত্ত্বেও তুমি অন্যেক কাছে মান-সম্মান ও মর্যাদা তালাশ করো! তুমি তো এমন মুসীবতে পতিত ব্যক্তির মতো যাকে উপদেশ বা সতর্কতা করলে কিছুই তার কোন কাজে আসে না অথচ সে অন্যকে উপদেশ ও ধমক দেয় যে তার মুসিবত দেখে শিক্ষা লাভ করো। সুতরাং তার এ উপদেশ (উপমা) উক্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভাব ফেলে নি, অথচ তার অবস্থা অবলোকনকারীকে সে তিরস্কার করতে চায়।

সত্যিকারে কোন কিছু চাওয়া ব্যক্তি তার ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে কিছু হারালে তখন তিনি অন্তরে ও হৃদয়ে তা পরিপূর্ণ করে নেয়, দুনিয়ার কিছু ক্ষতি হলে আখিরাতে তা বাড়িয়ে দেয়, দুনিয়ার কোন ভোগ-বিলাস থেকে নিষেধ করা হলে তার বিনিময়ে তাকে আখিরাতের আনন্দ উপভোগ বৃদ্ধি করে দেয়, সে উদ্বিগ্নতা, দুঃখ-বেদনা ও বিষণ্নতায় পতিত হলে আখিরাতে এর পরিবর্তে আনন্দ ও সুখ প্রাপ্ত হয়।

অতএব, দুনিয়াতে দৈহিক, আর্থিক, ভোগ-বিলাস, ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি ও নেতৃত্বে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এর বিনিময় যদি আখিরাতে কল্যাণ অধিক বয়ে আনে তা ব্যক্তির জন্য রহমতস্বরূপ ও কল্যাণকর অথবা এগুলো তার প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য গুনাহর শাস্তিস্বরূপ অথবা প্রকাশ্য ও গোপনীয় ওয়াজিব কাজ বর্জন করার শাস্তিস্বরূপ। কেননা

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া এ চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর কাছেই তাওফীক কামনা করছি।

পরিচ্ছেদ: আল্লাহর সমীপে সফর

মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই সফর করছে। তাদের এ ভ্রমন জান্নাতে চিরস্থায়ী শান্তির আবাসন বা জাহান্নামে চিরস্থায়ী শাস্তির জায়গায় গিয়েই থামবে।

জ্ঞানী মাত্রই এ কথা জানে যে, সফরে রয়েছে কষ্ট-ক্লেশ ও ভয়ংকর পথচলা। আর এটি অসম্ভব যে, সফরে স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ ও প্রশান্তি পাবে। এগুলো তো সফর শেষে প্রাপ্ত হবে। একথা সকলেরই জানা যে, সফরের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং প্রতিটি মূহূর্তই বিরামহীন ও ক্ষণস্থায়ী এবং কেউ থেমে নেই। এটি প্রমাণিত যে, সে সার্বক্ষণিক সফরের রসদ-সামগ্রী নিয়ে এমনভাবে সফর করছে যা একজন মুসাফির করে থাকে। সে যখন কোন স্থানে অবতরণ করে বা নিদ্রা যায় বা বিশ্রাম করে তা শুধু তার পরবর্তী সফরের প্রস্তুতির জন্যই করে থাকে।

ফায়েদা: বান্দার মধ্যে শয়তানের প্রবেশদ্বার

প্রত্যেক জ্ঞানীই জ্ঞাত যে, শয়তান মানুষের মধ্যে প্রবেশের তিনটি পথ রয়েছে। সেগুলো হলো:

প্রথমত: অতিরঞ্জন (প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ) ও অপচয় করা। ব্যক্তির প্রয়োজনের বেশি হবে এবং তা তার জন্য অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য হবে। এ অতিরিক্ত অংশ শয়তানের এবং তা শয়তান ব্যক্তির

অন্তরে প্রবেশের পথ। এ থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে, খাদ্য, ঘুম, ভোগ-বিলাস ও বিশ্রাম প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা। এ পথ বন্ধ হলে তার চিরশত্রু শয়তানের তার মধ্যে প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত: অসতর্কতা ও অলসতা: সদা সতর্ক ব্যক্তি সতর্কতার দুর্গে থাকে। যখনই সে অসতর্ক হয়ে যায় তখনই তার দুর্গের দরজা খুলে যায়। ফলে তখন শত্রু তার দুর্গে ঢুকে পড়ে। তখন সে তার উপর চড়াও হয় এবং তাকে সেখান থেকে তাড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত: অনর্থক কাজে কৃত্রিমতা দেখানো।

ফায়েদা: সর্বোত্তম ও সর্বাধিক উপকারী যিকির

কেউ কেউ মনে করেন, যিকিরকারীগণ প্রথমে মুখে যিকির শুরু করে, এভাবে মুখে যিকির করতে করতে অবচেতনেও মুখে যিকির করতে থাকে। অত:পর, এভাবে যিকির চলতে থাকে, এমনকি তার অন্তরে যিকির চালু হয়ে যায়।

আবার কেউ মনে করেন, এভাবে অন্তরে যিকির জারি হয় না এবং অবচেনত অবস্থায়ও যিকির শুরু হয় না; বরং সে ভাব-গম্ভীরভাবে থাকে তখন তার অন্তরে যিকির চালু হয়। অতএব, সে শুরুতে অন্তরের দ্বারা যিকির শুরু করে, যখন অন্তরে তা শক্তিশালী হয় তখন জবান তা অনুসরণ করে এবং তখন অন্তরে ও জবানে একত্রে যিকির জারি হয়ে যায়।

অতএব, প্রথম প্রকারে যিকির ব্যক্তির জবান থেকে অন্তরে চালু হয়। আর দ্বিতীয় প্রকারের যিকির অন্তর থেকে জবানে জারি হয়, তবে তা অন্তরের থেকে খালি হয় না; বরং প্রথমে জবানে প্রকাশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত অন্তর শান্ত থাকে। অতঃপর অন্তরে তা গভীর গেঁথে যায়, তখন সে সব কিছুতে আল্লাহর যিকির অনুভব করে।

সর্বোত্তম ও সর্বাধিক উপকারী যিকির হলো যেখানে অন্তর জবানের সাথে একত্রিত হয়। এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকির, এতে যিকিরকারী যিকিরের অর্থ ও উদ্দেশ্য অবনুভব করে।

পরিচ্ছেদ: মানুষের জন্য সর্বাধিক উপকারী মানুষ

তোমার জন্য সবচেয় উপকারী সে ব্যক্তি যে তোমাকে নিজের থেকে (ভালোকাজের জন্য) যোগ্য করে তোলেছে, এতে তুমি কল্যাণকর কাজ বা ভালো কিছু উৎপাদন করতে পারো। কেননা এটি তোমার উপকার ও পরিপূর্ণতার জন্য কতই না উত্তম সাহায্য। তার দ্বারা এ ধরণের সাহায্য প্রকৃতপক্ষে তার নিজের দ্বারাই তোমাকে সাহায্য করার মত বা এর চেয়েও উত্তম সাহায্য। অন্যদিকে তোমার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর মানুষ হলো সে ব্যক্তি যে তোমাকে গুনাহের কাজে উপযুক্ত করে তোলে, এমনকি তুমি এতে আল্লাহর অবাধ্যতা করো। কেননা এটি তোমার ক্ষতি ও অপূর্ণতা জন্য তার সহযোগিতা।

ফায়েদা: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিফাযত (সংরক্ষণ)

বান্দার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর আল্লাহর আদেশ রয়েছে, এতে তার জন্য রয়েছে নিষেধাজ্ঞা, এতে তার জন্য রয়েছে নি'আমত, উপকারীতা ও স্বাদ। বান্দা যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আল্লাহর সেসব আদেশ যথাযথ পালন করে এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকে তাহলে সে তার নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করল, তাকে প্রদত্ত নি'আমতের পূর্ণতা আদায় ও এর দ্বারা স্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করল। আর যদি সে আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত না থাকে তাহলে সে আল্লাহর দেওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শুকরিয়া আদায় করল না, তখন আল্লাহ উক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা উপকারীতা নষ্ট করে দেন এবং এগুলোকে তার দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষতির অন্যতম বড় উপকরণ করে দেন।

বান্দার ওপর প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর 'উবুদিয়্যাত করা অত্যাবশ্যকীয়, সে উক্ত 'উবুদিয়্যাত পেশ করবে এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করবে। সে যদি তার সময়কে 'উবুদিয়্যাত পালনের মাধ্যমে কাজে লাগায় তাহলে সে আল্লাহর সমীপে অগ্রসর হবে, আর যদি সে তার সময় প্রবৃত্তি, আরাম-আয়েশ ও অলসতায় কাটায় তাহলে রবের থেকে দূরবর্তী হবে। সুতরাং বান্দা হয়ত তার রবের নিকটবর্তী হবে অথবা তাঁর থেকে দূরে সরে যাবে, সে এ দু'পথের মাঝে স্থির থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَتَقَدَّمَ أَوۡ يَتَأَخَّرَ٣٧﴾ [المدثر: ٣٧]

তোমাদের মধ্যে যে চায় অগ্রসর হতে অথবা পিছিয়ে থাকতে, তার জন্য। [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৩৭]

ফায়েদা: আল্লাহ ব্যতীত অন্যের থেকে তোমার অন্তরকে খালি (মুক্ত) করো

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রবৃত্তিকে পরিহার করা (যদিও তা আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি দেয় এবং তাঁর রহমত লাভের দ্বারা সফলতা অত্যাবশ্যকীয় করে) আল্লাহর ভাণ্ডার, সৎকাজের ভাণ্ডার, ভালোবাসার স্বাদ, তাঁর প্রতি আসক্তি, তাঁকে নিয়ে আনন্দিত ও খুশি হওয়া ইত্যাদি যার অন্তর অন্যের সাথে সম্পৃক্ত তার অন্তরে অর্জিত হয় না, যদিও সে ইবাদতকারী, আত্মশুদ্ধি অর্জনকারী ও ইলমের অধিকারী। কেননা যার অন্তরে তিনি ব্যতীত অন্যের স্থান রয়েছে এবং যার হিম্মত অন্যের সাথে সম্পৃক্ত তার অন্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁর ভাণ্ডার প্রদান করেন না। যার অন্তর আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হওয়াতে দরিদ্রতাকে ধন-ঐশ্বর্য্য মনে করেন, তিনি ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে প্রকৃত দরিদ্রতা মনে করেন, তিনি ব্যতীত অন্যের সম্মানকে বে-ইজ্জতি মনে করেন, তাঁর অপমানকে ইজ্জত মনে করেন, তিনি ব্যতীত অন্যের নি'আমতকে আযাব মনে করেন, আর তাঁর সাথে থাকলে আযাবকে নি'আমত মনে করেন।

মূলকথা, বান্দা আল্লাহ ব্যতীত তার জীবন-মরন কিছুই কল্পনা করতে পারে না, তিনি ব্যতীত সবকিছুতে দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা মনে

করেন। এ ধরণের বান্দার জন্য হয়েছে দু'টি জান্নাত। একটি দুনিয়াতে তাৎক্ষণিক আরেকটি কিয়ামতের দিন।

ফায়েদা: আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের (নিবেদিত হওয়ার) হাকীকত

আল-ইনাবা তথা আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন হলো অন্তরে তাঁর প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়া, নিবেদিত হওয়া ও আসক্ত হওয়া। যেভাবে মসজিদে শারীরিক 'ইতিকাফ করা হয়, যা তাকে মসজিদ থেকে আলাদা করে না। এর মূলকথা হলো, আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর মহত্ব ও সম্মানের যিকির, ইখলাসের সাথে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ ইত্যাদি নিবেদিত অন্তরে করা। যেমন নিবেদিত ইমামগণের ইমাম (ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম) তার জাতিকে বলেছিলেন,

﴿مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ ۝٥٢﴾ [الانبياء: ٥٢]

"এ মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর পূজায় তোমরা রত রয়েছ?" [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৫২]

উপকারী কায়েদা: সর্বাধিক উপকারী চিন্তা-ভাবনা

সব কল্যাণ ও অকল্যাণ মূলত চিন্তা-ভাবনা থেকেই উৎসারিত। কেননা মানুষের চিন্তা-ভাবনা কোনো কিছু ত্যাগ করা, বিরত থাকা, ভালোবাসা ও অপছন্দ করার ইচ্ছা ও প্রত্যাশার মূল। সবচেয়ে উপকারী চিন্তা-ভাবনা হলো, পরকালীন কল্যাণ ও তার কীভাবে অর্জন করা যায় এবং

পরকালীন অকল্যাণ প্রতিহত করা ও কীভাবে তা থেকে বেঁচে থাকা যায় সেসব কিছুর চিন্তা-ভাবনা।

এর পরবর্তী স্তরে রয়েছে চার ধরণের চিন্তা-ভাবনা। সেগুলো হলো, দুনিয়ার কল্যাণ ও তা লাভের চিন্তা-ভাবনা এবং দুনিয়ার অকল্যাণ ও তা থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা-ভাবনা। এ আট ধরণের চিন্তা-ভাবনায়ই জ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনা ঘূরপাক খায়।

কায়েদা: সমস্ত কল্যাণের সমষ্টি

চাওয়া (আশা করা) হচ্ছে ঈমানের পুষ্পরেণু (মূল)। যেহেতু ঈমান ও চাওয়া যখন একত্রিত হয় তখন তা কল্যাণকর কাজের ফল দেয়।

আল্লাহর সম্পর্কে ভালোধারণা হলো তাঁর কাছে ধন্যা ধরা (অভাবগ্রস্ত) ও তাঁর কাছে নিরুপায় হওয়ার পুষ্পরেণু (মূল)। এ দু'টি যখন একত্রিত হয় তখন দো'আ কবুলের ফল দেয়।

আল্লাহর ভয় তাঁর ভালোবাসার মূল। অতএব, যখন ভয় ও ভালোবাসা একত্রিত হয় তখন তা তাঁর আদেশ মান্য করা ও তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকার ফলাফল দেয়।

ধৈর্যধারণ হলো ইয়াকীনের মূল। অতএব, ইয়াকীন ও ধৈর্য যখন একত্রিত হয় তখন তা দীনের ইমামত তথা নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ٢٤﴾ [السجدة: ٢٤]

“আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।” [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ২৪]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঠিক অনুসরণ হলো ইখলাসের মূল। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঠিক অনুসরণ ও ইখলাস একত্রিত হয় তখন তা আলম কবুল ও গ্রহণযোগ্য হয়।

আমল হলো ইলমের পরাগ। অতএব, ইলম ও আমল যখন একত্রিত হয় তখন তা সফলতা ও সৌভাগ্যের ফল দেয়। এ দু’টি একটির থেকে আলাদা হলে কোনো উপকারে আসে না।

সহিষ্ণুতা ইলমের পরাগ। এ দু’টি একত্রিত হলে দুনিয়া ও আখিরাতের নেতৃত্ব অর্জিত হয় এবং বিশ্বের জ্ঞান দ্বার উপকৃত হওয়া যায়; কিন্তু এ দু’টি একটির থেকে আলাদা হলে ব্যক্তি উপকার থেকে বঞ্চিত হয়।

দৃঢ়প্রত্যয় সূক্ষ্মদৃষ্টির পরাগ। এ দু’টি একত্রিত হলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের অধিকারী হয় এবং তার হিম্মত সর্বত্রে উঁচু থাকে। অতএব, পূর্ণতার অভাব হয়ত দূরদৃষ্টি বা দৃঢ়প্রত্যয়ের অভাবে হয়ে থাকে।

ভালো নিয়াত সুস্থ বিবেকের মূল। যখন একটি হারিয়ে যাবে তখন অন্যটিও হারিয়ে যাবে। আর যখন উভয়টি একত্রিত হবে তখন সব ধরণের কল্যাণের ফল দিবে।

সুস্থ মতামত বীরত্বের পরাগ। যখন উভয়টি একত্রিত হয় তখন ব্যক্তি বিজয় ও সফলতা লাভ করে। এর একটি হারিয়ে গেলে পরাজয়, অপমান ও ভীরুতা পেয়ে বসে। বীরত্ব ব্যতীত মতামত হলো ভীরুতা ও অক্ষমতা। আবার সঠিক মতামত ব্যতীত বীরত্বের ফলাফল হলো পরাজয় ও ধ্বংস।

ধৈর্য দূরদৃষ্টির পরাগ। যখন উভয়টি একত্রিত হয় তখন কল্যাণ সাধিত হয়।

হাসান বসরী রহ. বলেছেন, তুমি যদি কাউকে ধৈর্য ব্যতীত দূরদর্শী দেখ অথবা দূরদর্শিতা ব্যতীত ধৈর্যশীল দেখ তাহলে তাকে অকৃতকার্য দেখবে। আর যদি কাউকে ধৈর্যশীল দূরদর্শী দেখ তাহলে তাকে সফল দেখতে পাবে।

নসিহত হলো বিবেকের মূল। যখন নসীহত শক্তিশালী হবে তখন তার শক্তিশালী ও আলোকিত হবে।

আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর চিন্তা-ভাবনা আখিরাতের সফলতার মূল। দু'টি একত্রিত হলে দুনিয়া বিমূখীতা ও আখিরাতের প্রতি আগ্রহ জন্মায়।

আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার প্রস্তুতির সরঞ্জামের মূল হলো দুনিয়াতে দীর্ঘদিন না থাকার আশা করা। দু'টি জিনিস একত্রিত হলেই তাতে

কল্যাণ একত্রিত হয়। আর এ দু'টি বিষয় আলাদা হলে সব ধরণের অকল্যাণ দেখা দেয়।

উঁচু হিম্মতের মূল হলো সহীহ নিয়াত। এ দু'টি বিষয় একত্রিত হলে বান্দা তার কাঙ্খিত ফলাফল প্রাপ্ত হয়।

কায়েদা: সালাতে আমাদের অবস্থা।

দুটি অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সম্মূখে দণ্ডায়মান হয়। একটি সালাতে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হয়, আরেকটি কিয়ামতের দিনে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রথম দণ্ডায়মান যথাযথভাবে করবে তার জন্য দ্বিতীয় দণ্ডায়মান (কিয়ামতের দিনে) সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি প্রথমটিতে অহবেলা করবে এবং যথাযথ হক আদায় করবে না তার জন্য দ্বিতীয় দণ্ডায়মান অত্যন্ত কঠিন হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَٱسۡجُدۡ لَهُۥ وَسَبِّحۡهُ لَيۡلٗا طَوِيلًا ٢٦ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلۡعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمۡ يَوۡمٗا ثَقِيلٗا ٢٧﴾ [الانسان: ٢٦، ٢٧]

আর রাতের একাংশে তার উদ্দেশ্যে সাজদাবনত হোন এবং দীর্ঘ রাত ধরে তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন। নিশ্চয় এরা দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাসে আর তাদের সামনে রেখে দেয় এক কঠিন দিন। [সূরা আল-ইনসান, আয়াত: ২৬-২৭]

কায়েদা: দুনিয়া ও আখিরাতের সুখের পার্থক্য

সুখ-শান্তি সকল মানুষেরই কাম্য; বরং প্রতিটি প্রাণীরই কাঙ্খিত বিষয়। সুতরাং সুখকে সুখ হিসেবে পেলে তাকে কেউ নিন্দা করা হয় না। কিন্তু সুখটি ভোগের চেয়ে যদি ত্যাগ করা অধিক কল্যাণকর হয়, এর চেয়ে অধিক উপকারী ও পূর্ণাঙ্গ কিছু প্রাপ্তির আশা থাকে থাকে বা এ সুখের পরে যদি এর চেয়ে বড় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় তখন সে সুখটি ভোগ করা নিন্দনীয়। এখানেই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী এবং অজ্ঞ আহমকের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি যখন দু'টি সুখ ও দু:খের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে এবং একটির সাথে অন্যটির তুলনা হয় না তখন সে দু'টি সুখের মধ্যে অধিক বড় সুখ পাওয়ার জন্য ছোটটি ত্যাগ করে এবং কঠিন কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দু'টি কষ্টের মধ্যে অধিকতর সহজ কষ্টটি ভোগ করে।

এ কায়েদাটি যখন আপনার কাছে স্পষ্ট হলো তখন জেনে রাখুন, আখিরাতের সুখ-শান্তি দুনিয়ার সুখের চেয়ে অধিক ও চিরস্থায়ী। আর দুনিয়ার সুখ তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী। এমনিভাবে আখিরাতের দুঃখ-কষ্টও দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের চেয়ে মারাত্মক ও যন্ত্রনাদায়ক। এ সব নির্ভর করে ঈমান ও ইয়াকীনের ওপর। সুতরাং ইয়াকীন যখন শক্তিশালী হয় এবং অন্তর সে কাজে সম্পৃক্ত হয় তখন সুখ ভোগের ক্ষেত্রে অন্তর ছোটটির ওপর বড়টিকে প্রধান্য দেয় এবং দুঃখ-কষ্ট ভোগের ক্ষেত্র অধিক কঠিন শাস্তির তুলনায় অধিকতর সহজ কষ্টকে মেনে নেয়। আল্লাহই সাহায্যকারী।

কায়েদা: দো'আর ক্ষেত্রে নবীদের শিষ্টাচারসমূহ

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَأَيُّوبَ إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ٨٣﴾ [الانبياء: ٨٣]

“আর স্মরণ করুন আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৮৩]

এ দো‘আয় তাওহীদের হাকীকত ও নিজের অভাব, রবের সমীপে তার প্রয়োজনীয়তা, তাঁর তোষামোদে ভালোবাসার স্বাদ পাওয়া, তাঁর রহমতের গুণের স্বীকৃতি, তিনি যে আরহামুর রাহিমীন তথা সর্বাধিক দয়াবান তা স্বীকার করা, তাঁর গুণাবলীর উসিলা দেওয়া, নিজের কঠিন অভাবের কথা প্রকাশ করা ইত্যাদি একত্রিত হয়েছে। মুসিবতে পতিত ব্যক্তি যখন এভাবে বিনীতভাবে নিজের অভাবের কথা বলবে তখন তাঁর মুসিবত দূর করা হবে।

বলা হয়ে থাকে যে, তিনি এ দো‘আ সাতবার বলেছেন (বিশেষভাবে একথা জানার পরে) আল্লাহ তার বিপদ দূর করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী ইউসুফ ‘আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে বলেছেন,

﴿أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ تَوَفَّنِي مُسۡلِمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ١٠١﴾ [يوسف: ١٠٠]

“হে আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০০]

এ দো‘আয় তাওহীদের স্বীকৃতি, রবের কাছে আত্মসমর্পণ, তাঁর কাছে মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ, তিনি ব্যতীত অন্যের অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত থাকা ইসলামের ওপর মারা যাওয়া বান্দার সর্বাধিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আর এটি বান্দার হাতে নয়; বরং আল্লাহর হাতে, কিয়ামতের স্বীকৃতি ও সৌভাগ্যবানদের সাথে থাকার প্রত্যাশা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

কায়েদা: আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ﴾ [الحجر: ٢١]

“আর প্রতিটি বস্তুরই ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে আমার কাছে।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ২১]

এ আয়াতে সব জিনিসের ভাণ্ডার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার কাছে সব জিনিসের ভাণ্ডার রয়েছে এবং যার কাছে সে ভাণ্ডারের চাবি একমাত্র তার কাছেই সব কিছু চাওয়া হয়। তিনি ব্যতীত অন্য কারো চাইলে সে কিছুই দিতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلۡمُنتَهَىٰ﴾ [النجم : ٤٢]

“আর নিশ্চয় তোমার রবের নিকটই হলো শেষ গন্তব্য।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৪২] এখানে মহাভাণ্ডারের কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর তা হলো, প্রতিটি অভীষ্ট লক্ষ্যের যদি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু না থাকে তাহলে তার সাথে মিলিত হওয়া বেহুদা ও সম্পর্কহীন কাজ। কেননা সেটি তার শেষ গন্তব্য নয়। যার কাছে সব কিছুর শেষ গন্তব্য একমাত্র তার কাছেই সব কিছুর শেষ গন্তব্য হওয়া উচিত। তাঁর সৃষ্টি, ইচ্ছা, হিকমত ও ইলমের কাছে সবকিছুর গন্তব্য। তিনি সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের লক্ষ্য। আর প্রত্যেক প্রিয়বস্তুকে কোন উদ্দেশ্যে ভালো না বাসলে তখন তার ভালোবাসা যন্ত্রনা ও আযাব হয়ে দাঁড়ায়। উদ্দেশ্য বিহীন কাজ শ্রমকে বিনষ্ট ও বাতিল করে দেয়। আর প্রত্যেক অন্তর যা আল্লাহর সাথে মিলিত হয় না তা দুর্ভাগা ও তার সুখ-সৌভাগ্য ও সফলতা থেকে আড়ালকৃত।

সুতরাং নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহর কাছে সব কিছু চাওয়া একত্রিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ﴾ [الحجر: ٢١]

“আর প্রতিটি বস্তুরই ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে আমার কাছে।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ২১] আবার এ আয়াতে বান্দার জন্য যা কিছু চাওয়া তার সব কিছু একত্রিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلۡمُنتَهَىٰ﴾ [النجم : ٤٢]

“আর নিশ্চয় তোমার রবের নিকটই হলো শেষ গন্তব্য।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৪২] সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত বান্দার জন্য কোনো লক্ষ্যস্থল নেই যেখানে সে কিছু চাইতে পারে এবং তিনি ব্যতীত কোন গন্তব্যও নেই যার কাছে তার শেষ গন্তব্য হবে।

এ সব কিছুতে রয়েছে তাওহীদের এক মহারহস্য। আর তা হলো, আল্লাহর কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত অন্তর স্থির হয় নাও শান্ত-শিষ্টও হয় না। তিনি ব্যতীত অন্যের জন্য যা কিছুই ভালোবাসা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য করা হয় তা তাদের জন্য হয়ে থাকে।

অন্যদিকে প্রিয় গন্তব্য একমাত্র একজনের দিকেই হতে হয় যার কাছে শেষ গন্তব্য। আর শেষ গন্তব্য দুজনের কাছে হওয়া অসম্ভব। যেমনিভাবে সৃষ্টির শুরু দুজনের থেকে হওয়াও অসম্ভব ছিলো। সুতরাং যার শেষ ভালোবাসা, অভীক্ষা, আশা-আকাঙ্খা ও আনুগত্য তিনি ব্যতীত অন্যের জন্য হবে তার সব আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং তাঁর থেকে তা দূরীভুত হয়ে যাবে। আর যার ভালোবাসা, আগ্রহ, ইচ্ছা, আকাঙ্খার গন্তব্য একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে সে ব্যক্তি চিরকালের জন্য তাঁর নি‘আমত, (তাঁর সাক্ষাতের) স্বাদ, আনন্দ ও সুখ-সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবে।

কায়েদা: আল্লাহর তাওফীক লাভ ও নিরাশ হওয়ার কারণসমূহ

এ ব্যাপারে আমি চিন্তা-গবেষণা করলাম। পরিশেষে দেখলাম, তাওফীক লাভের মূল হলো তুমি একথা ভালোকরে জান যে, সমস্ত নি‘আমত একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে, চাই তা আনুগত্য করার নি‘আমত বা স্বাদ

ভোগের নি‘আমত। সুতরাং তাঁর কাছেই বিনীতভাবে নি‘আমত চাও, তিনি তোমাকে তাঁর যিকির করার অনুপ্রেরণা দিবেন এবং তাঁর শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক দান করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمَا بِكُم مِّن نِّعۡمَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيۡهِ تَجۡـَٔرُونَ٥٣﴾ [النحل: ٥٣]

“আর তোমাদের কাছ যে সব নি‘আমত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর দুঃখ-দুর্দশা যখন তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা শুধু তার কাছেই ফরিয়াদ কর।” [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৫৩]

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَٱذۡكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ٦٩﴾ [الاعراف: ٦٨]

“সুতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর নিআমতসমূহকে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।” [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৬৮]

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ١١٤﴾ [النحل: ١١٤]

“এবং আল্লাহর নি‘আমতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তারই ইবাদত করে থাক।” [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ১১৪]

এসব নি'আমত যেহেতু একমাত্র তাঁর থেকেই এবং শুধু তাঁর দয়ায়ই, সুতরাং এসব নি'আমতের যিরিক ও শুকরিয়া তাঁর তাওফীক ব্যতীত অর্জিত হয় না।

আল্লাহর থেকে নিরাশ হওয়া ও বান্দাহকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া গুনাহ। তিনি যদি বান্দাহর থেকে তার নিরাশা দূর না করেন তাহলে বান্দা নিজে তা দূর করার ক্ষমতা নেই। তাই বান্দা তার নিরাশা ও এর কারণসমূহ দূর করতে আল্লাহর কাছে বিনীত হতে বাধ্য, যাতে তার থেকে হতাশা ও নিরাশা সংঘটিত না হয়। কিন্তু তাকদীরের ফয়সালায় ও মানবীয় চাহিদায় যদি নিরাশা সংঘটিত হয়ে যায় তাহলেও সেগুলো দূর করতে ও এর শাস্তি থেকে রেহাই পেতে সে আল্লাহর কাছে বিনীত হতে ও তাঁর কাছে দো'আ করতে বাধ্য। বান্দা এ তিন উসূলের ব্যতীত তার প্রয়োজন মিটাতে পারে না, এ তিনটি উসূল ব্যতীত তার সফলতাও নেই। উসূল তিনটি হলো, আল্লাহর শুকর, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং খাঁটি তাওবা।

জ্ঞাতব্য যে, নিরাশার কারণ হলো ব্যক্তিকে যে মূলের ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে সেভাবে অবশিষ্ট থাকা, একে অবজ্ঞা করা ও সে মূল অবস্থা শূণ্য করা। অতএব, নিরাশার কারণ মূল সৃষ্টিগত অবস্থা থেকেই। আর তাওফীকের কারণ আল্লাহ তাকে নি'আমত গ্রহণের উপযোগী করেছেন। সুতরাং তাওফীকের কারণ তাঁর থেকেই এবং তাঁর দয়ায়। তিনিই এদুটির স্রষ্টা। যেমনিভাবে তিনিই জমিন সৃষ্টি করেছেন। কিছু জমিন শস্য ও উদ্ভিত জন্মানোর উপযোগী করেছেন, আবার কিছু জমিন শস্য ও

উদ্ভিত জন্মানোর অনুপযোগী করেছেন। তিনিই বৃক্ষ-রাজি সৃষ্টি করেছেন। সেসব বৃক্ষের কিছুতে ফল হওয়ার উপযোগী করেছেন আবার কিছু ফল না হওয়ার উপযোগী করেছেন। তিনি খেজুর গাছকে ফলবান হওয়ার উপযোগী করেছেন, এ থেকে তিনি বিভিন্ন ধরণের রস (শরবত) উৎপাদন করেন। অন্যদিকে তিনি মিষ্টি ডুমুরকে রস উৎপাদনের অক্ষম করেছেন। তিনি পবিত্র আত্মাসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো তাঁর যিকির, শুকর, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, তাওহীদ ও নসীহত গ্রহণের উপযোগী। অন্যদিকে তিনি খবিশ আত্মা সৃষ্টি করেছেন সেগুলো উপরোক্ত নি‘আমতসমূহ গ্রহণ করতে অনুপযোগী; বরং পবিত্র আত্মার বিপরীত। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ।

সমাপ্ত

এ বইটিতে ইবনুল কাইয়্যেম রহ.-এর আল-ফাওয়ায়েদ অবলম্বনে ইসলামের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক এতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জানতে পারবেন: কীভাবে কুরআনের দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়? আল্লাহ জমিনকে মানুষের অধীনস্থ করে দিয়েছেন, মানুষের সৌভাগ্যের কারণসমূহ, কীভাবে তোমার রবকে চিনবে? উদ্বিগ্নতা ও দুঃখ-কষ্টের দো'আ, আল-কুরআনের সম্বোধনের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা, সূরা আত-তাকাসুরে গভীর দৃষ্টিপাত ও চিন্তা-গবেষণা, দুনিয়ার হাকীকত, সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, হারাম কাজে পতিত হওয়ার কারণসমূহ, জলে-স্থলে ফিতনা-ফ্যাসাদ প্রকাশ, অনুতপ্ত হওয়ার আগেই অনুতপ্ত হও, তাওহীদের উপকারীতা, সর্বাধিক সুখময় বিষয় ও প্রশংসিত বন্দীশালাসহ আরো অনেক কিছু।